ঃ গোবিন্দ ভট্টাচার্য
সীমান্ত
৬ সি রাজকুমার চক্রবর্তী সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৯
গ্রন্থসত্ত্ব · শিউলি রায়
প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ১৯৬০. পৌষ ১৩৬৭
প্রচ্ছদ ঃ রমেন আচার্য
মুদ্রক ঃ স্বকুমার দে
বাসন্তী প্রেস
১৯এ, ঘোষ লেন, কলকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

রবীন স্থর

তরুণ সেন

বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)

১. আসলে সে নিজের ধিক্কার

আসলে সে নিজেই যে নিজের ধিক্কার।
তাই তার ঘৃণা
প্রায় বিশ্বমানবকে, তাই তার রাগ
অসহায় অপারগ অশক্ত শিশুরও ভিড়ে খোঁজে
প্রতিহিংসার শিকার।

দুর্বুদ্ধি কাদায় ভারি গাদাবন্দুকের ফাঁকা তাগ—
সে ক'রে চলেছে নিত্য কোনও টোটা বিনা,
নিজেই সন্ত্রাসে চোখ বোজে
দুই হাত স্ফাতোদরে, পৌরুষের মরিয়া বিকার।
মানুষ যখন হয় মনুষ্যত্বহীনতার উন্মাদ ধিক্কার

তখন কী বিড়ম্বনা আমাদের কোনও লাভ নেই তাকে হেঁকে দূর-দূর
যে জানে না কোনও ভাষা। তখন গর্জায় জনসাধারণ্যে ঘৃণা,
ভেঙে যায় ভেদাভেদ শত্রুর বন্ধুর,—
হন্যে-দেওয়া শিকারীই অন্তে হয় নিজের শিকার।
কে কবে লড়ায়ে নেমে মারে প্লেগবাহক ইঁদুর?

অরুণ মিত্র (১৯০৯)

২. একখানা গাইলে বটে

"একখানা গাইলে বটে তুমি' ব'লে আমি খুব তারিফ করলাম। আমাকেই করলাম। আমি কত বড় গুণী তা আমি বুঝি। আমার খোঁচখাঁচগুলো এমন সূক্ষ্ম হয় সরাসরি রক্তে গিয়ে পৌঁছয় এবং আমিই সেটা সবচেয়ে বেশী অনুভব করি। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি এবং এবার আমার গুরুত্ব আমি আরও ভালো করে উপলব্ধি করেছি।

মানুষগুলো একটু দূরে ছিল। তবে আমি ওদের বেশ দেখতে পাচ্ছিলাম,

মানে আমার ঢুলুঢুলু চাউনি মাঝখানের জায়গাটা ডিঙিয়ে ওদের উপর গিয়ে পড়ছিল। ওদের পিঠের উপর। ওরা এক মস্ত অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি অবিশ্যি আঁচ টের পাইনি, কিন্তু আভা দেখেছিলাম। ওদের শরীরের পাশ বরাবর ঘামের ধারাগুলো রক্তের মতো বইছিল। আমার বিশ্বাস ওরা মুখ ঘুরিয়ে আমাকে শুনলে কষ্ট ভুলত। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও কেউ ফেরেনি। ওরা যেন আগুনের সঙ্গে আটকে গিয়েছিল।

যেখানে আমি মশগুল ছিলাম সেখানে খাটাশ মেঠো ইঁদুর শেয়ালরা এদিক ওদিক থেকে উঁকি দিচ্ছিল আমি দেখেছি। এমন কি তারা আমার খুব কাছে এসেছিল। তাদের চোখগুলো আগ্রহে চকচক করছিল। এতে আমি অসম্ভব প্রেরণা পেয়েছি। ঐ কানগুলো তৈরী হয়েছে কি হয়নি সেই এক সন্দেহ ছিল। সেটার নিরসন হতে আমি বিশুদ্ধতার চূড়ায় উঠে গেলাম।

৩. চারপাইয়ের ওপর

চারপাইয়ের ওপর ছটফটাচ্ছে পিয়ারিয়া
এতকাল খাটাখাটনির পর ওর ছুটি মঞ্জুর হোক,
ছুটি ছুটি ক'রে ওর চোখ ঘুরছে
এপাশ ওপাশ করলে কাঁটায় চামড়া ছিঁড়ে যাচ্ছে
ছিঁড়ে যাচ্ছে প্রার্থনার শব্দগুলো
পেটবুকের জ্বলুনি আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে কাপড়চোপড়ে,
তবু চারপাই কি চিতা হয় কখনো ?
তার জন্যে শ্মশান লাগে হিসেব করা কাঠ লাগে আর মন্তর।

আর-একটু সবুর করো পিয়ারিয়া
ভালোবাসার কথা ভাবো,
বালবাচ্চা এণ্ডিগেণ্ডি ভালোবাসা থেকে এসেছে
মালিক মাল্‌কানি ভালোবাসার মুখ চেয়েই
তোমাকে ভিড়িয়ে দিয়েছেন রাত্তিরে
নেশার ঝাঝে উবিয়ে দিয়েছেন দিনের বেলাটা।
আর একটু সবুর করো পিয়ারিয়া
তোমার ছাই উড়বে ছুটির আকাশে।
তুমি পরী হয়ে যাবে, পরী।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (১৯১৭)

৪. শরতের দিন

এখন আর উজ্জ্বল আনন্দের কথা
কেউ জানতে চায় না ; দেখা হলেই
চোখে-মুখে অন্ধকারের ছোপ,
সবাই বিষাদের কথা বলে।

উজ্জ্বল রৌদ্রের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ
বলেনা কেউ :
ওই ছাখো রৌদ্রের স্বর্ণাভ স্রোত, কাশবন
কী সুন্দর,
অমল ধবল পালে লেগেছে হাওয়া,
কী শান্ত নীলিম আকাশ!

কেউ জানতে চায় না নতুন ক'রে ফের
কোনদিক থেকে সুরু ক'রতে হবে ;
পূব বা পশ্চিম
উত্তর বা দক্ষিণে
সর্বত্রই পোড় খাওয়া লোকগুলি একালে
নিজেদের চারপাশে
একটি করে বিষাদের ঘর বানিয়ে রেখেছে।

৫. চতুর্দিকে শব্দ

চতুর্দিকে শোভাযাত্রা শরবিদ্ধ সমগ্র শহর

কারা যায় কারা ফেরে দূর থেকে,
কে হারিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ,
খোঁজ রাখে না কেউ।
সারা শহরে শব্দ, ছেলেবেলায় শোনা নরম

আমআঁটির ভেঁপু নয়, কানে তালালাগানো
স্টিরিওর আওয়াজ, ট্রামবাসের ঘর্ঘর।
তীক্ষ্ণ হর্ণ, মিছিলে বিপক্ষীয়দের ধিক্কার ধ্বনি।

এ-এক পাঁচমেশালী শব্দ, বিশালবৃষভের মতো
প্রাচীন শহর কাঁপছে, ধুঁকছে
এই মুহূর্তে হাজার শব্দের তীক্ষ্ণ শরে আক্রান্ত ;
দুপুর থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত
মাঠে ময়দানে ফুটপাতে কে একজন
শব্দের তেলে ক্ষুধার কড়াইয়ে খৈ ভাজছে।

মনীন্দ্র রায় (১৯১৯)

সিঁড়ি

তোমরা আমার ওপর পা রাখো,
উঠে যাও ধাপে ধাপে আকাশের মুখোমুখী,
ছাখো সেখানে ভোরের আগে রঙবদলের খেলা
কিম্বা মাঝরাতে তারাদের রাজ্যে চোখ-টেপাটেপি হাসি :

তোমরা আমার ওপর পা রেখে
নেমে যেতে পারো রাস্তায়, কিম্বা শহর ছাড়িয়ে মাঠের দিকে,
মানুষের সঙ্গে মানুষ, আর গাছগাছালি পশুপাখির সঙ্গে মানুষ,
কিম্বা মাটির সঙ্গে ধাতুর সঙ্গে, শস্যের সঙ্গে মানুষ,
ঘামের রাজ্যে, কামের রাজ্যে, নামের রাজ্যে
সেইসব তাঁতের মাকুর মতো ছুটোছুটি,
আর তারপর আমার ওপর পা রেখে ফিরে এসো আবার
জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা নিজের ঘরের শিশুর দিকে।

মনীন্দ্র রায়

আমি প'ড়ে থাকব এখানেই
আকাশ আর মাটির মধ্যে, সৃষ্টির এক নির্জন কলাকৌশল-
মানুষের পায়ের ছোঁয়া ছাড়া যার
আর কোনো সার্থকতা নেই।

নৌকো পুড়িয়ে চলে এসো

পুরনো ইঁদারার সর্পিল অন্ধকার,
হিংসা-প্রতিহিংসার ধাপে ধাপে পা-ফেলা সিঁড়ি,
ডালিম গাছের টুকটুকে ফুলের পাশে
শূন্যে ঝুলন্ত সাপের খোলস,
বার তিথি ষড়ঋতু, আকাশচক্রের পরিধি—
ছিটকে পড়ুক পাটাতন থেকে, গলুই থেকে, মাস্তুল থেকে,
ঢেউ ভাঙুক জলকন্যার চুলের ঘূর্ণিতে, ডুবে যাক ;
নৌকো পুড়িয়ে চলে এসো

ছিঁড়ে যাক নাড়ীর বাঁধন, কাঁসা-পিতলের সংসার ;
ভেসে যাক ডোবানো প্রতিমার শোলার মুকুট,
পাপপুণ্যের কারু কাজ ;
জন্তুর গহ্বরের মতো ঐ তোমার স্মৃতি
জ্বলে উঠুক দাউদাউ জলের ওপর, জ্বলুক
নক্ষত্র ছড়িয়ে অন্ধকারে,
চলে এসো তুপকেট শূন্যতাকে উজাড় করে
কাদামাটির জন্মে, ছিন্ন কবি,
নৌকো পুড়িয়ে চলে এসো।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯)

৮. শূন্য নয়

লাবণ্য, একবার তুমি চোখ খুলে তাকালেই দেখতে পাবে মাথার ওপর
শূন্যতা কেবলমাত্র শূন্য নয় ; চাঁদ সূর্য গ্রহ তারা শূন্যে বাঁধে ঘর,
আলো বাঁধে ঘর দেখো অন্ধকারে ; দুই তীর দিয়ে বাঁধে নদীও নিজেকে
সমুদ্রে পড়ার আগে। জীবনের সেই এক বৃত্তে ঘুরি আমরা প্রত্যেকে।
জন্মেই মৃত্যুর চিন্তা, প্রেমে জাগে বিচ্ছেদের ভয়, পদে পদে ভুলভ্রান্তি
অথচ জীবন তার চেয়ে বড়ো, ঢের ঢের বড়ো ; শিশিরবিন্দুর শান্তি
ঘাসের ডগায় দোলে, পুলকিত পত্রগুচ্ছ বাতাসের নিশ্বাসে নিশ্বাসে
হাত নেড়ে বলে: বাঁধো, নীড় বাঁধো ; লাবণ্য, একবার তুমি তাকাও আকাশে ॥

৯. আমার কাজ

আমি চাই কথাগুলোকে
পায়ের ওপর দাঁড় করাতে।
আমি চাই যেন চোখ ফোটে
প্রত্যেকটি ছায়ার।
স্থির ছবিকে আমি চাই হাঁটাতে।

আমাকে কেউ কবি বলুক
আমি চাই না।
কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে
জীবনের শেষদিন পর্যন্ত
যেন আমি হেঁটে যাই।

আমি যেন আমার কলমটা
ট্রাক্টরের পাশে
নামিয়ে রেখে বলতে পারি—
এই আমার ছুটি
ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও ॥

১০. এক মাঘে শীত যায় না

বাছারা যাতে কিছুতেই অনশনে না মরে
তাই পাঠানো হয়েছিল
কামান-দাগা ট্যাঙ্ক

পাছে তারা নাকের জলে চোখের-জলে হয়
কাঁদানে গ্যাসের মজুতে তাই
টান পড়েছিল

ময়দানের এ-কোণ থেকে ও-কোণ
কচি কচি গলায়
ঢেউয়ের মতন আছড়ে পড়ছিল গান :
'শেষ যুদ্ধ শুরু আজ, কমরেড
গাও ইন্টারন্যাশনাল
মিলাবে মানবজাত'

আর ভিড়ের মধ্যে একা হয়ে
ছবির হরফে তখন একজন চিঠি লিখছিল :
'আমরা কোনো অন্যায় করিনি, মাগো...'

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ঠিক তখনই

শূন্য শ্মশানে শুরু হল
রক্তবসনে
জনগণতান্ত্রিকের শবসাধনা

টাটকা ঘাসের চাপড়ে
চাপা পড়ে গেল চাপ চাপ রক্ত
ঝাঁটার হাত ফস্কে থাকার মধ্যে রইল

জামার কয়েকটা বোতাম, জুতোর ছেঁড়া ফিতে
মাথার কয়েকটা ক্লিপ
বইয়ের ভাঁজ থেকে খসে-পড়া ফুলের শুকনো পাপড়ি

দেয়ালের লেখাগুলো বুকের মধ্যে খোদাই হয়
কানের কাছে গুন গুন করে গান—
'একবার বিদায় দে মা, ফিরে আসি ॥

চিত্ত ঘোষ (১৯২০)

১১. জন্মভূমির দিকে

নিকটে শীতল নদী
জলস্রোত ছিল।

আমার চেতনভোর
রৌদ্র আহরণে গেছে
চোখ বাঁধে নদীর কুয়াশা।

কোনদিকে আমার জন্মভূমি।

আমি যাবো
জন্মভূমির দিকে যাবো
জন্ম নিতে যাবো
আমার দ্বিতীয় জন্ম
আমার আরেক জন্ম

মাঠের ধান ও দূর্বা
মাঠের বাতাস
অন্ধকার সন্ধ্যার পাহাড়
মিলিত মৌলিক যোগ

চি ত্ত ঘো ষ

ব্যবধান
সমন্বয়
এ বাতাবরণ
কোনদিকে আমার জন্মভূমি।

একটি সবুজ গাভী দেহময়
শাদা গাঢ় বিন্দু বিন্দু মিষ্টি উষ্ণ দুধ।
কান্নার অতীত প্রান্তে
শীতের জ্যোৎস্নার দিকে হেঁটে চলে গেছে
মৃতবৎসা
মাঠে শুয়ে স্বপ্নের জাবর কাটে।

এ পরবাসে
এইখানে
জন্মভূমি থেকে এত দূরে
রক্তের ভিতরে
খুঁজে পাবে?
ফিরে পাবে নাকি সেই মায়া বৃক্ষ
বৃক্ষের হৃদয়।

এই পরভূমি
ছায়াও পড়েনা রৌদ্রে

আমি যাবো
এই পরভূমি ছেড়ে
জন্মভূমির দিকে যাবো।

১২. নিহিত

আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে
একটা বিমূর্ত অবয়ব আছে।
তার অস্থিতে ঘুণ, হৃৎপিণ্ড কৃত্রিম
রক্ত দূষিত, স্নায়ু বিনষ্ট
তার যকৃতে ঘা, স্বভাবে প্রতারণা
প্রয়াসে দুরভিসন্ধি।
আমাদের শরীর সময় ও অন্ধকার
বিষাক্ত বায়ুমণ্ডল কোন পরিণতির কাছে সমর্পিত।
মাটিতে পাহাড়ে বৃক্ষে জলাশয়ে জমে আছে
অন্তর্নিহিত মৃত্যুর আগুনের ভস্ম।
ঘরের দেয়ালে টাঙানো
পুরোনো বাতিল ফটোর প্রিয় মানুষজন এখন পাথর
হাসপাতালে রোগীর টেম্পারেচার চার্টে
ভালো মন্দর ওঠা-নামা।
দয়ামায়া ভাবভালোবাসা প্রভৃতি শব্দের পুতুল নিয়ে
সভ্যতা খেলা করে।
আমাদের সামনে এখন সেই বিমূর্ত অবয়ব
যার শরীরের অভ্যন্তরে নিহিত
একটা ভয়াবহ বিস্ফোরণের বিপদ
প্রাচীন পিচ্ছিল কচ্ছপের মতো গুড়ি মেরে চলেছে।

অথচ আমরা নদীতে ভোর দেখেছি
শঙ্খচিলের গলার সাদা ছোপ দেখেছি
মাছের রূপালি মৃত্যু দেখেছি
রাত্রির মাঠে অসংখ্য জোনাকির আগুন নিয়ে খেলা দেখেছি
গাঙশালিকের কান্নায় গাছের পাতা ভিজে যেতে দেখেছি।

আমাদের আগে আগে ভয়াবহ বিস্ফোরণের সেই বিপদ
একটা প্রাচীন পিচ্ছিল কচ্ছপের মতো গুড়ি মেরে চলেছে।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯২১)

১৩. **ষাট বছরের**

ষাট বছরের সিঁড়ি ভেঙে উঠে হঠাৎ একলা ছাদের আমি
হারিয়ে যাওয়ার মুখোমুখি যেন রবি ঠাকুরের বালিকা বামি.
এই রূপময় বনান্ধকার তারা-ফুটফুট হাসিতে চেয়ে :
দুঃখ কেবল হানবে না কেউ কটাক্ষ লাজবন্তী মেয়ে।

ছেলেবেলা ছিল বাসনা মনের মগডালে উঠে দুনিয়া দেখা.
কৈশোরে মনগড়া দুনিয়ায় নিজেকে ভেবেছি একক, একা.
আজ শূন্যের চোখে চোখ এক-আকাশ তারায় হয়েছি কানা :
দুঃখ কেবল জানবে না কেউ স্বপ্নের নেই বয়স-মানা।

হয়ে যৌবনে সওয়ার ছুটেছি চমকে দমকে রঙে ও রূপে
পেশীপারুষ্য জয়রোমাঞ্চ এঁকে রেখে গেল এ-দেহকূপে.
আজ সবই স্মৃতি, তবু স্মৃতি সেই সময়ওড়ানো বিস্ফোরণই :
দুঃখ কেবল মানবে না কেউ যৌবন দেহদীর্ণ মনই।

১৪. **প্রতিধ্বনি**

একটা মন আছে ঘুমে, অন্য মন জাগা-য়
একটা ঘর অন্ধকার—আলো ঠিকরে লাগায়
অন্য ঘর ছায়ার সূচীমুখ চমকে হীরে :
স্বঘর দেখে ঢোকে আকাশ হাহা উদোম হয়ে
সঙ্গে ভোরপাখির বাসা সবুজ পাতা চিরে
মেঘবৃষ্টিশিশির-ঝোরা অঝোর যায় বয়ে।

একটা মন পৌঁছে যায় অন্য মন চিনে
বন্ধদোর-রাতে ঘা দ্যায় সেতার রিন্‌রিনে
অন্ধকারে সে আঁকে জলরঙিন ছায়াভাষ-ই—

একটুকরো আকাশ ক'টা কথার আঁকিবুকি
সে-কথা বিদ্যুৎ কথায় বৃষ্টি আসি-আসি –
স্বপ্ন-যেন ঘুমের মনে ছবিটা খায় উঁকি।

একটা মন বাহির-ঘর একটা মন ভেতর
ভেতর থেকে খোঁচায় কে-যে : বল্ তো আমি কে তোর
বাইর পাগল-পাগল ফেরে—বাইর বড্ড হ্যাঁপা—
লড়াই করে সারা অঙ্গ সহস্রটা ক্ষত
মন ওঠে না কিচ্ছুতে না ও-যে লড়াইখ্যাপা
বদলে নেবে দীনদুনিয়া ইচ্ছেটা এমত।

ভেতর-মন তলায়. খোঁজে নীরব কি নিভৃতি
কিংবা কলরব-থিতনো রেশটুকু যা স্মৃতি :
লড়াই ছেঁকে নেয় কুড়িয়ে কেন্দ্রভেদী ছবি
কান পাতে সে বুক যখনই জোড়ে লম্ফঝম্প
বাহির-মন যদি ঝিমিয়ে যায়—ভোলে না ভবি
তুলে নিশান শুনিয়ে গান জাগায় ভূমিকম্প।

রাম বসু (১৯২৫)

১৫. জরাইকেলার রাত্রি

এবং সেই অবিস্মরণীয় রাত্রি
জরাইকেলার স্তব্ধ কোরকে
সুগন্ধি সমাহিত চোখের পাতা বিদ্ধ করে
সমুদ্রের হাসির মতো
বুকের প্রবাল প্রাচীরের গায়ে আছড়ে পড়লো

চোখের মণিতে কাঁটার তিক্ততা
আশা হতাশার আলোকলতা

অন্তরীণের বিক্ষুব্ধ কণ্ঠ
কিছুই থাকলো না

আমি কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে নিইনি
আমি বরং সব আবিলতা সরিয়ে
প্রসারিত হয়ে ছিলাম নিরাসক্ত নগ্নতায়

সত্তার ওপর থেকে জরতপ্ত আবরণ খসে গেল
কপালের গ্রহণের অন্ধকারও কৃষ্ণগোলাপ
আমি আদরের আঙুল রাখলে
সে গেয়ে ওঠে অপরিমিতের গান

আমি কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে নিই নি
বরং প্রসারিত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী আকাশ

যে হৃদয় সমর্পিত স্বপ্নে শ্রমে রূপে
ইতিহাসের ভাঙাগড়া যার দেহের কাঠামো
তার কাছে অবহেলার কিছুই নেই
সে তো সম্রাট-ভিক্ষুক
বিশালতার অনুশাসন তার কাছে প্রত্ন নয়

এবং এই স্মরণীয় রাত্রির কোরকে
আমাকে আরো প্রসারিত হতে হবে
আলোর উৎসের তিমির থেকে অন্ধকার উৎসের আলো অবধি
জরাইকেলার পাথরের প্রান্ত থেকে হাজার আলোক-বর্ষ দূরের নীহারিকায়
কারণ পরাজিতের স্পর্ধা হল নিজেকে গড়ে তোলা অপরিমিতের ছাঁদে।

১৬ অসতো মা

এক

শব্দ, শব্দ, চারিদিকে শব্দ ভেঙে পড়ে
যেন কোন জলপ্রপাতের ধারে ঝড়ের দাপট
নুয়ে আসে গাছপালা
বজ্রের থাবায় যেন উঠে আসে হৃদপিণ্ড আমার
পুনর্বার হাঙরের দাঁতের করাত ফাড়ে
রেঁ্যালা, গ্যাটে, শীলারের বুক
নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাস
দম বন্ধ করে দেয় রবীন্দ্রনাথের।
নদী নদী কলকল ছলছল নদী
এ জীবন হতো যদি নদী।

পুনর্বার এশিয়ার পবিত্র প্রান্তরে দেখি
ভারসাম্যহীন অস্থির মাতন
ঈগলের ইস্পাত চঞ্চুতে
ছিন্ন হবে কপোতের বুক
পিকাসো, পিকাসো তুমি গুয়ের্নিকা আঁকবে কি আবার ?
কত দাম দিতে হবে আর ?
দিতে হবে আরো কত আলেন্দে মুজিব ?

নদী নদী কল কল ছল ছল নদী
আমাদের এ জীবন নদী হতো যদি ··

এবার হিটলার নয়, মুসোলিনী নয়
তাদের ক্লেদাক্ত প্রেত, বাজপাখি
শান দেয় ছুরিতে আবার
নামাবলী গায়ে দিয়ে দরবেশী আরঙ্গজেবের মতো
তাক করে বুকের পাঁজর।

মানুষ, মানুষ, অসহায় মানুষ আমার
মনে রেখো : আলেয়া আলোর শত্রু

নদী নদী কলকল ছলছল নদী...
আলেন্দে, মুজিব
তোমাদের পরিত্যক্ত কবরের পাশে
আমার এ দুটি চোখ মাটির প্রদীপ
স্বদেশ আমার, তোমার শিয়রে নগ্ন বিভীষিকা দেখে
শিউরে উঠি আমি
ছাড়িয়ে নিজের সীমা অস্তমিত আমার যৌবন
আগ্নেয় চিৎকার তোলে : সাবধান
দিয়াগো গার্সিয়া
আমার শিরার পুঞ্জে গঙ্গা মেশে ভলগাতে আবার
প্রৌঢ়ের কপালে জ্বলে ত্রয়োদশীর চাঁদ।
নদী, নদী, কলকল ছলছল নদী

দুই

এই তো এখানে আমি
জ্বলন্ত জংলায় অবরুদ্ধ স্বর
হিংস্র জল আর ফেনার নিবিড়ে
দিকভ্রান্ত জাহাজের সাইরেন
এক হাত ছিন্ন, অন্য হাতে ভিক্ষাপাত্র
শম্ভু, আমি তোমার অসীমতার প্রার্থী
জীবন, এই আমি মৃত শহরের ত্রয়োদশী চাঁদ।

এই তো এখানে আমি
কোটি কোটি বেকারের বিকৃত বিলাপে, যেখানে
রৌদ্রহীন লেনে বিষাক্ত আগাছার মতো শিশুর উদ্ভব
ধুলোর জিভ চাটে হৃদয়ের কোমল সঞ্চয়
আর ওপড়ানো চোখের গর্তে জমে মাকড়সার জাল

এই তো এখানে আমি, যেখানে
গঙ্গার ধারে কালো টাকা ছিঁড়ে আনে মানুষের নাড়ি

আর বাঁচার বর্বর ও প্রাগৈতিহাসিক শক্তি
বেপরোয়া ষাঁড়ের মতো ফুঁড়ে ফেলে কমলা দিগন্ত

এই তো এখানে আমি
এই রক্তের পাঁকে আর আর্তনাদে
এই বিমর্ষ বৃক্ষের গৌরবে ও অশ্রুতে
সাবধান
তোমর থাবা গুটিয়ে নাও
আমি রক্তের পাঁকে পা পুঁতে দাঁড়িয়ে আছি
সাবধান
আমি জেনেছি মানুষের পরিমাপ
একমাত্র মানুষ, মানুষ
এই নদী একদিন আমাদের পরিচ্ছন্ন করে দেবে।

তিন

আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি
কবিতাকে বাজি রেখে বলছি আবার
গান্ধী মরে নি শুধু গডসের গুলিতে
গান্ধী মারা গেছে তার চারপাশে থাকা
নামাবলী মোড়া হায়নার দাঁতে।
আমি আগেও বলেছি এবং আবার বলবো
স্থিতাবস্থা নয়, রূপান্তর চাই
রূপান্তর—ভিতরে বাইরে, সামগ্রিক
চাই মেরুদণ্ড সোজা করে প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া
নগাধিরাজের।

আমি আগেও বলেছি এবং আবার বলছি
স্থিতাবস্থা নয়, বেনের চাতুর্য নয়
আমি চাই নবম তরঙ্গে চূর্ণ হোক প্রাক্তন পৃথিবী
রাজনীতি নয়, কূটচাল নয়, চাই

বুকের নিষ্পাপ দীপ্তি শ্রম, স্বাধীনতা
শোষণের দুর্গগুলি চূর্ণ করে তৈরি করা গোলাপ বাগান

আমি আগেও বলেছি এবং আবার বলছি
'সিয়া' শুধু সংগঠন নয়, মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি
জীবনের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য
তোমার আমার মধ্যে আছে কি না খ্যাখো
তন্ন তন্ন করো

আমি বলতে চাই
বহুযুগ আগে যা কৃষ্ণ বলেছেন
আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখাও।

আমি বলতে চাই
শক্তি তো উপায় মাত্র
লক্ষ্য নয়, সিদ্ধি নয়, পুরুষার্থ নয়।

চার

এই মৃত পুষ্প আর বিশ্বাসের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাও
তিলোত্তমা স্বদেশ আমার
তোমার সেই সুন্দর প্রতিরোধে
যা দুধোলো শঙ্খের মতো ভারী ও নরম
ফিরিয়ে দাও আমার মুখের দীপ্তি, আমার ঔদ্ধত্য।

আমি নিবেদিত করে দিলাম নিজেকে
শিকড় আর আলোর সাম্রাজ্যের ওপারে
পচা পাতা আর নীল স্তব্ধতার সীমান্তে
আমি এখন খুঁজে বেড়াই
তোমার তরঙ্গিত শরীরের চঞ্চলচঞ্চল কলধ্বনি।

বারুদের উজ্জ্বল পাখি বাসা বেঁধেছে আমার কণ্ঠে
তার আরক্ত ডানার ঝাপটে দোলে পবিত্র এশিয়া
অবরুদ্ধ বুকের দুর্গে তুলে ধরেছি প্রেমের পতাকা
ছাল চামড়া ওঠা জীবনের ওপর বিছিয়ে দিয়েছি স্বপ্ন
আর আশ্রয় খুঁজেছি তোমার মাধুর্যের স্থিরকেন্দ্রে

আমাকে মিলিয়ে দিতে হবে দুই বিপরীত
সৃষ্টি যেমন মিলিয়ে দেয় সমস্ত বিরোধ
বিশ্বের প্রাণ ছন্দের তালে তালে বেঁধে নিতে হবে একতারা
আর নিজেকে প্রসারিত করে দিতে হবে সীমার ওপারে
যেন আদিম উর্বরতার অঙ্কুরগুলি মেতে ওঠে যূথনৃত্যে ;

স্বদেশ আমার, আলেয়া আলোর শত্রু
ক্ষতের গোলাপ কুঁড়ি—জননী আমার
অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়

১৭. আমি টের পাচ্ছি

আমি এক নিমেষের জন্যও ভুলি না
আদিত্য দুহিতা পৃথিবী এক পলকে হতে পারে ছাই
কমলালেবু রঙের হিম ঝড় জরায়ু থেকে খুঁটে নিতে পারে
জীবনের বীজ যার অপরিমেয়তা প্রেমিকার চুম্বনের চেয়েও উজ্জ্বল
যে মহৎ মন্ত্রগুলি আমরা উচ্চারণ করে এসেছি এতকাল
যার ঊর্মিল উপলে মৌসুমী পাখির পাতাবাহার ডানার শিশির
যা চোখের পাতায় জ্বলজ্বল করা সুদীপ্তির শুচিতা
চোখের পলকে তা হতে পারে রিক্ততার একমুঠো ছাই

মানুষের বিবেকের কাছে এত বড় প্রশ্ন আসেনি কখনো
সময়ও চায় নি কখনো বিবেকের দর্পিত উত্তর

অভ্যাসের সরীসৃপ-বিবর্ণ চোখের পাতায়, নীচে হিমবাহ
দুঃখের থাবায় খোবলানো শরীরে বিছুটির কালসিটে দাগ
বোধ ও ভাষার অতীত আমাদের গা-সওয়া পৈশাচিকতায়
কিছু যেন উঠে আসছে আত্মচেতনার মেঘবর্ণ পাখার ঝাপটে
আকাশে ঝড়ের সংকেতে মাতাল মেঘের ঊর্মিল আবর্ত
অনিবার্যতার মতো আঁস্তাকুড়ে দিব্য অঙ্কুরের উদ্ধত উল্লাস

আমি টের পাচ্ছি জরায়ুতে বীজের মুগ্ধ ও অমোঘ আলোড়নে
জরাহীন আলোকবৃত্ত, শ্যামল অন্ধকারে সুস্পষ্ট নক্ষত্র

বিবেকের কাছে এত বড় প্রশ্ন আর আসেনি কখনো
সত্তার জৈবিক বিবর্তন দর্পিত উত্তরের এত সুলগ্ন দেয়নি কখনো

কৃষ্ণ ধর (১৯২৬)

১৮. বধিরতা বিষয়ক

হাতের মুঠোতে ধরা ছিল শস্যবীজ
তুমি দ্যাখোনি
চোখে ছিল শস্যের স্বপ্ন
তুমি দ্যাখোনি।

সে এসে আভূমি আনত হয়ে উচ্চারণ করেছিল মন্ত্র
ঊষর মাটির বুকে জাগাতে প্রাণের অঙ্কুর
এমন একটা কল্পকাহিনী বারেবারেই ফিরে আসে
তুমি শোনোনি

সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই চলছে
শস্যের জন্য প্রাণের জন্য শ্রমলিপ্ত মন্ত্রোচ্চারণ
তুমি শোনো নি

বধির পাঁচিলে মাথাকোটা শেষ হয়নি আজো।

১৯. ভোরের রুমাল

এক একটা সময় আসে যখন হাতের মুঠোতে
জীবনকে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়
সামনের রোদ্দুরের দিকে।
রোদ্দুর তো বরাবরই জীবনকে ডাকে
তখন মনে পড়ে যায় সেই দিনগুলির কথা
বাস্তিলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে
যখন তারই সহোদর শেকলভাঙার গানের কোরাসে
গলা মিলিয়েছিল।
ইতিহাসে আগুন-রঙা বিরাট ক্যানভাস জুড়ে
তাদের স্বাক্ষর তখন চোখের সামনে
জ্বল জ্বল করতে থাকে।
যেন সর্বস্ব দেবার জন্যেই
তাদের এই রমণীয় প্রস্তুতি
প্রতিটি বাঁকে মৃত্যুর অতল গহ্বরের
হাতছানি উপেক্ষা করে
ওরা চূড়ার দিকে এগিয়ে যায়।
বন্দীশালার পাঁচিলের পাঁজর ফাটিয়ে
যে চারাগাছটায় ফুল ফুটেছে
তাকে ওরা সব সময় আগলে রাখে।
অন্ধকারের পা-দানিতে দাঁড়িয়ে ওরা তাই
ঠিক দেখতে পেয়ে যায়
ভোরের রুমাল নাড়া।

বিতোষ আচার্য (১৯২৬)

২০. আর একবার

এখন অনেক রাত, চাঁদ চলে গেছে বেশ আগে
ভাদ্রের সড়কে শুয়ে বুক খুলে ছুঁয়েছি আকাশ
মাঝে মাঝে চমকে দেয় অন্ধকারে কিসের ফিসফাস. .
হাইটেনশনের তারে বিদ্যুতের শব্দ একা জাগে
আলগোছে কে যেন ডাকে, মোহিনী নিঃশ্বাসে কী যে স্বাদ-
আশ্লিষ্ট আবেগে কেঁপে স্থিরতা হঠাৎ পলাতক :
বহুদিন সুপ্ত থেকে যে আদিম বিশ্বাসঘাতক
ফের জাগে, বিছায় সে পুরাতন বহুবর্ণ-ফাঁদ
সে শয়তান চিরকাল হ্যাঁচকা তুলে উড়ন-চাকিতে
নিরুদ্দেশ নদীমাঠে, বরারোহা-অভীপ্সার হ্রদে
ফেলে গেছে, অসহায় অস্তিত্বের ভগ্ন, নগ্নপদে
তারপর গৃহেফেরা. মজে থাকা বিষম সাকাতে

স্থিরতা পালাক, তবু আরেকবার ডুবুরির মতো
নেমে দেখি কী এষণা মূল নাড়ে, গভীরতা কতো।

সিদ্ধেশ্বর সেন (১৯২৬)

২১. যখন স্বয়ং মার্ক্স

কেন মানবিকতায় নয়, যখন স্বয়ং মার্ক্স
কী তাঁরও ঈপ্সা, তাতে বলেছেন, মানবীয়
সবই—ঈস্‌কাইলাস, গ্রীক, থেকে রাজতন্ত্রী
বালজাক ফরাসীর, এলিজাবেথীয়
সেক্সপীয়রের নাট্যে পান মানুষেরই স্বকীয়
দ্বৈতের ভূমিকা—
ক্যাপিটাল, মহাগ্রন্থ, এমন উল্লেখে তাই বিপ্লবীর
শিক্ষা হ'য়ে থাকে ;

আর লেনিন তো নিয়ে তাঁর বিপ্লবেরই তিতিক্ষা—
তলস্তয়ে দর্পণে-প্রতিভাসে, সর্বহারা-মুঝিকে
দেখান সম্বন্ধপাতে—
তবু বীথোভেনে কান দেন, নবম সিম্ফনিতে, আবেগে
আবার চলেও যান, কর্মযোগী, রাষ্ট্রে ও বিপ্লবে

এই-সবই ধরেছি, আমি, মানবিক ঐতিহ্যবিস্তারে
নতুন ঐতিহ্যে যার পুনঃস্থিতি—
পোল গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রে-পেরেস্ত্রৈকা রুশে

বা চিরায়ত রূপকে যেমন আমাদেরই রবীন্দ্রনাথ
দেখে নেন আমূল-বিপ্লব, রাশিয়ার চিঠি-র সাক্ষ্যে, সদ্য-সোভিয়েতে
মানবিক সভ্যতারই পটে, রেখে

আর একবার চীনযাত্রী কবি, ফিরে এসে
সে-প্রাচীন সংস্কৃতি চর্চা চান শান্তিনিকেতনে, ভারতীয়ের চীনাভবনে,
যেটুকু জেনেছি আমি,
তবুও শিউরে-উঠে জানি, আজ দেহে-মনে একুশের শতকের দিকে, শিউরে উঠে,
বিদ্যার্থীর-শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্নকূট সহস্রের
সেই দেশে, তরুণপ্রাণে শুধু প্রাণই পাত
শুধু ট্যাঙ্কের-মর্টারের অমানুষিক চাপ
জমে বিকার-প্রলাপ নাট্যে, কেন অগণ্যের ঢলে
সঙ্গিনের রক্তস্নান,
শুধু, হায় বিপ্লবের—, তিএন্‌আন্‌-মেনে ॥

২২. দ্বান্দ্বিক গোধূলিতে

এই-সূর্যাস্ত চলে যায় ওই সূর্যোদয়ে, জাহাজের ডেক থেকে
দেখা, উষা চেয়ে,
দৈনিকের-আহ্নিকের স্রোতে ভেসে
আমি জেগে উঠি অবসানে-জয়ে
পৌনঃপুনিকে, মৌল-প্রতিমায়

আমি সাধ্যকে চেয়ে দেখি কিনারায়, সাধ
নিয়ে জেগে,
আমার উপরে অভাবনীয়ের বিশ্বের
নিত্যসম্মোহ—
এখন দিনও নেই, রাত্রিও সন্ধ্যাপার কোনো
প্রকৃতি, সন্ধি-আচ্ছন্নতায়

তোমাকেও নিয়ে আসি, দেখাই, কেননা তোমাতে
অন্ধগতি ঘোরে,
সময়ের জোড় খোলে, বৈপরীত্যে, মায়া
তোমাকে ভোলাবে সে কী ঐচ্ছিকে, কল্পনায় ?
তোমাকেই নিয়ে আসি আমার জ্ঞানের ভিতরে
এই জানা অজানার মতো ঠেকে, জানা

কূল ভাঙে স্রোতও পাল্টায়
ভাদ্রের কোটাল জোয়ারে সমুদ্রে হানা
অনন্ত গোধূলি পশ্চিমঘাট ধ'রে জলে নেমে যায়

কোন পূবে পূরবী বিভাসে মেশে, উদয়ে, চিরচেনা
দ্বান্দ্বিকের গোধূলিভাষায়
আমি শুনি
পৌনঃপুনিকে, মৌল-প্রতিমায়।

ধনঞ্জয় দাশ (১৯২৬)

২৩. পালাতে পারি না

আমি আর পালাতে পারি না।

কেননা যে-বৃক্ষে বাস
যার শাখা আমার আশ্রয়
আদিম শিকড় তার
ভল্গা-গঙ্গা পার হয়ে চ'লে গেছে
শত শত শতাব্দীর পার।

প্রাচীন এ-বৃক্ষ তবু জাদু জানে
আমাকে সে নিত্য বাঁধে কঠিন মায়ায়
সালোক-সংশ্লেষ কিংবা প্রস্বেদনে
দিন-রাত্রি মন্ত্র প'ড়ে
সে আমাকে ফুটতে বলে
তার ঐ প্রবীণ শাখায়।

অথচ জানে না সে
প্রাচীন বৃক্ষের কাণ্ড জীর্ণ হয়
কালাতিক্রমণদুষ্ট পুরু ত্বক ফেটে যায়
শুষ্ক শাখা টানেনা মাটির রস
বিষাক্ত লতার ফাঁস নেমে আসে
শীর্ণ ডালে শুয়ে থাকে সাপের খোলস।

সব জানি, তবু ঐ শাখার আশ্রয় ছেড়ে
চ'লে যেতে বড় মায়া লাগে
বৃন্তচ্যুত হতে খুব ভয়
তাই আমি পালাতে পারি না।

মৃগাঙ্ক রায় (১৯২৭)

২৪. সবিতাআত্রেয়ীচিত্রা

সগরশিবাজীসমীর এক দাঁতে দাঁত ঘষা দ্বন্দ্বের ভিতরে ছিল ;
হঠাৎ তারা চলে গেল একদিন, চলে গেল কাদম্বিনীলাবণ্যনলিতা।
তারপর অমলঅর্জুনতারাপদরা এল, এল সবিতাআত্রেয়ীচিত্রা,
আরেকদ্বন্দ্বের দাঁত, প্রেমপরাজয়পরিতাপ জিঘাংসা জয় হত্যা।
তারপর আবার কারা এল, নারীপুরুষ মাতাবধূ বারবনিতা।
তারা কেউ ট্রামে চড়ে নিজের দ্বন্দ্বকে আবিষ্কার করে নিতে
ডালহৌসী গেল, কেউ লাঙলের মুখে মাটি চিরে সিঁথি কাটল,
ঘর বাঁধল, পুকুর খুঁড়ল, ছিপের ডগায় ফড়িং এসে বসলো কারো।
তারপর তারাও একদিন কি যেন কি পেয়ে গিয়ে
হঠাৎ চলে গেল।

তারপরেও রোদ ছিটকে উঠে ভোর হল, রক্ত ছিটকে পড়ে
খুন হল, প্রেম পেয়ে গিয়ে প্রবেশের অন্ধকারে পা দিল পুরুষ ;
শুধু ধৃতরাষ্ট্র অনড়, আবহমান অপরিবর্তনীয়, ঋতুচক্র
যুগ জন্ম যামিনী বা উদয়াস্ত কখনো দেখেনি বলে
কালাতীত।।

২৫. নিহত দ্রৌপদী

তোমার আর আমার নগ্নতার মধ্যে
কে রেখে গেছে এই দীর্ঘ তরবারি—
এই রক্ত, ঈশ্বর আর আয়ুধ,
মরুভূমির বলিরেখা আর সাপের খোলস,
কে রেখে গেছে এই ভাঙা কলসি, নাভিমূল
আর রাবণের পায়ের ছাপ।

তোমার খুব কাছেই
গড়িয়ে নিচে নেমে গেছে
পৃথিবীর বিভ্রন্ত পিঠ,
কলকল করছে সন্ধ্যার তরল আকাশ
আর নদী
আর আমি
আর আমার শরীরের গাছ, মাংস, মাটি।

তোমার খুব কাছেই
আমার ঘরবাড়ি, শহর জলাধার
মিছিল, মশাল,
ভেঙে-পড়া শ্বেত পাথরের সিঁড়ি
শ্মশান, কালো কাপড় মুখে
অন্ধকার ফটোগ্রাফার।
তোমার খুব কাছেই
আমার শরীরের গাছ।

অথচ তোমার আর আমার স্পন্দনের মধ্যে
কে রেখে গেছে এই নিহত দ্রৌপদী।।

গোবিন্দ ভট্টাচার্য (১৯৩০)

২৬. যে কিশোরী প্রগাঢ় জননী

দুধে ধোয়া আকাশ-অঙ্গনে
লক্ষ্মীর সরার মত চাঁদ
মাটি থেকে ভিজে গন্ধ
উড়ে যায় স্বর্গীয় উদ্যানে
ধানের শীষের মত টলমল আনন্দ-বৈভব
হেঁটে যায় রাতের শরীরে
অন্ধকার আলো ক'রে

ট্রেনের এঞ্জিন থেকে ছিটকে পড়া ফুলকির মত
কারা ঝরে
বিস্ময় অথবা বিপন্নতা !

সব কলরোল মন্ত্রে স্থির
প্রতিবিম্বে যে যার নিজের দিকে অনিমেষ
মাধুর্য আত্মস্থ ক'রে যে কিশোরী প্রগাঢ় জননী
তার কপালে উজ্জ্বল
লক্ষ্মীর সরার মত চাঁদ।

২৭. শব্দের কুহকে

যার গায়ে হাত দেন চেনা গন্ধ
যাকে তুলে চোখের সম্মুখে দোলান
তারই মুখে গভীর চুম্বন-চিহ্ন নখের আঁচড়
দস্যুরা কি কাউকে ভোলে না

দুর্ধর্ষ পণ্ডিত চান কবি কিছু শব্দ জন্ম দিক
সেই শব্দে প্রাসাদ বানাক
সময়ের প্রথাসিদ্ধ অবয়ব ভেঙে
নতুন শব্দের সঙ্গে কবি ফের বাসর জাগুক

কাঁচি আর ঝুড়ি নিয়ে কবি যান শব্দের বাগানে
এর মধ্যে একটিও কি অপাপবিদ্ধতা নেই
একটিও কি শব্দ নেই যাকে নিয়ে লুটোপুটি করেনি কবিরা
কুমারী শব্দের খোঁজে কবি যান বনে

মর্মরে কুজনে কিম্বা বাঘিনীর প্রণয়-গর্জনে
সনাতন শব্দাবলী ঘাঁটি গেড়ে আছে

গুপ্তশিকারীর বন্দুকের ভাষা গাছেরাও চেনে
এখনো মেঘের কণ্ঠে গুরুগুরু প্রাচীন ডমরু

যেতে যেতে যেতে যেতে নিশি পাওয়া কবি
ধীরে ধীরে উঠে যান পাহাড় চূড়োয়
নিচে উপত্যকা জুড়ে অশ্রু আর রক্তস্রোতা নদী
অবিশ্বাসী কুয়াশায় ঢেকে যায় পড়শীর মুখ

অত উঁচু থেকে সমতল-দৃশ্যাবলী নজরে আসে না
অনাঘ্রাতা শব্দের সন্ধানে ভূতগ্রস্ত কবি
ক্রমাগত চড়াই ভাঙেন
শব্দ নয় কবি অবয়বহীন কিছু দৃশ্য জন্ম দেন।

সুধেন্দু রায় (১৯৩০)

২৮. হাত ধুয়ে নাও

হাত ধুয়ে নাও
স্রোতে ভেসে যাক
হাত থেকে
নখ থেকে
ঘৃণিত কলুষ চিহ্ন
নির্মম হত্যার ও ধ্বংসের।

ধুয়ে মুছে সমস্ত রক্তের দাগ
আততায়ী হাত
যেভাবে নিষ্পাপ সেইভাবে
ধুয়ে নাও হাত।

বাঘের পায়ের ছাপ
বনভূমে থাকে যদি

থাক, মানুষ তো বাঘ নয়,
রক্তে মাংসে এক
পৃথক শরীর।

সে-ই জানে বিচিত্র লীলায়
অনুপম শোকের প্রকাশ
প্রতিটি হত্যার শেষে
উল্লাসের তবলায় লহরা বাদন।

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়   (১৯৩২)

২৯ **সমুদ্র ফুরায়**

মনের গহনে তুমি অগ্নি
রৌদ্রের শিখা দীপ্যমান।
তোমার চোখের কোলে জ্যোৎস্নার ঝড়—
সুদৃঢ় সংহত উদ্ধার।

আমি শুধু ভুগি যন্ত্রণায় :
অদৃশ্য শিকড়ে—
অনুভূতি চাঁদ হয়ে হৃদয়ের আকাশ জ্বালায়!
তুমি এক উদ্ভাসিত নীল
তোমাকে জানার আগে সমুদ্র ফুরায়।

৩০. **হনন**

এখন সূর্যাস্ত; নির্লিপ্ত গাছেরা রৌদ্রময়
এখন পশুরা কাঁদে পাখিরাও কাঁদে
হতাশা এখন পাতা খসানোর ঝোঁকে
                    দোলায় শিকড়-ফাটা মাটি;

বিভ্রান্ত জলের ঢেউয়ে দিবসের শেষ ঝাঁপ বাকি।

যে আমাকে হানে
ঘনভার রাত্রির আড়ালে
সে কি সব চায় :
সূর্যাস্ত শিকড় মাটি অভিজ্ঞতা প্রগাঢ় ময়ূর
অধীত জীবন থেকে খসেপড়া সোনালি পালক।
তার কাছে তবে কেন হাঁটু গেড়ে
প্রতীক্ষায় পাথর প্রহর ?

অন্তিম ক্ষুধার থেকে পরিত্রাণ নেই,
তবু চিরদুঃখী মেঘ সম্মত জলের কাছে যায়
বাতাসে মোচড় লাগে থেমে যায় তাবৎ হনন ;
রক্ত ফুটে ওঠে
ফুসফুস মথিত করা লাল আগুনের ঝোঁকে
নির্লিপ্ত গাছেরা
সৌরমাঠে হেঁটে যায় বেসামাল শিশুদের মত।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় (১৯৩২)

৩১. রাতদিন

ইঁদারার গোল জলে ভাসতে আমি দেখেছি সে চাঁদ
সে-ই ছিল আমার প্রমাদ।
কিশোরসময়কাল থেকে তাই চঞ্চল ভ্রমণে
কখনো ভুলেও কাশবনে
এমনকি....সত্যি, আনমনে
যাইনিকো, যাইনি আজো উতল অস্থির
কেননা ঐ ব্যাপারেই রাখিনেকো নিজেব নিবিড়
অহেতুক এলোমেলো কোনো বিসম্বাদ

সারারাত সারারাত প্রচুর তিমির
আরো কত রজনী তিমির ভরা তারা
ফুট্‌ফুট্‌ জেগে থেকে ঘুমোতে দেয়নি বুঝি যারা—
ভোরভোর স্বপ্নে গাঢ় শৈশবের ডাক দিয়ে যায়,
যেরকম দেশে মাঠে কার্তিকের প্রথম শিশির
ঘাসের জগতে ম্লান লেগে থাকে সকালের খড়ে
যেমন দরিদ্র খুব গরিব মানুষ আপন স্বভাবে গান গায়।

সকালের খড়, পাখি, ঘাসের জগতে
আনন্দে স্বাধীন এক বিপ্লবের গুপ্ত ঋতুপথে—
তেমনই তো, ভাসে, ছায়া-ছবির ইঁদারা
যে-তার আশ্চর্য তপ্ত গোল জলে ধরে সৌরকরোজ্জ্বল সাড়া।
এ যেন আবার কোনো অবিরল উদাস প্রহরে
কবেকার অন্যমন দূরদূর চৈত্রের হাওয়ায়
কেউ আনে কে-যে আনে…তাকে আনে, তার ভাবনায়
তার কথা শুধু মনে পড়ে।

এই যুদ্ধে, প্রেমে, দীর্ঘ বয়সে জীবনে
যতই সরিয়ে রাখি অহেতুক বাজে বিসম্বাদ
কিংবা শত চাঁদের প্রমাদ—
আমার কৈশোরে সেই কাশবন থেকে পলায়নে
ছোটে নাকি তাহারও শরীর।

বাতাস, তিমির কিংবা ঐ ইঁদারায়
ফুটে-ওঠা ভেসে-থাকা যত আছে তারা
তারও থেকে বেশি সে গভীর।
সে কি বন্ধু… মৃত্যুত্তীর্ণ, সারারাতদিন
উদ্বেল অমর অন্তহীন
ইঁদারার গোল জলে উজ্জ্বল ইশারা?

শহরে পাহাড়ে গ্রামে যেখানেই যাই
আরো যাই
পাশে পাশে শব্দহীন শুধু টের পাই
হাঁটে শান্ত তাহার শরীর।

তরুণ সান্যাল (১৯৩২)

৩২. সবরমতী

নদীর বালিতে জ্যোৎস্না শান্ত শাদা, নদীর চিকন জলে ছলছল সময়
এমন বিপুল শূন্য স্নিগ্ধতায়, সবরমতী, আছ শুয়ে কোন স্মৃতি বেদনাবিনত?
আমারও অনেক সুখ মুখ থুবড়ে অমনি বালিতে শুয়ে, ধবল নুড়ির বাঁকে
নরকরোটির পুঞ্জে, কঙ্কাল বলয়ে
আমারও অনেক সাধ অমনি চিকনজলে চূর্ণ যেন-তরঙ্গের ছুরিতে নিহত।

মধ্যরাতে জ্বলে ওঠে দাউ দাউ আকাশ. আর্ত নারীর জঙ্ঘায় তীক্ষ্ণ ধাতব আয়ুধ,
দিনগুলি শকুনের ডানায় শমশম হাওয়া, আরব সমুদ্রে হা হা লোনাস্ফুর স্ফীতি
আমি শুধু গুণে দিই অন্তরাত্মা, ত্রিশটি রূপার চাকতি এবং শোণিত ধূমে স্থদ
নদী, আ রে দূরপ্লাবী মানুষের বেদনার স্রোত, নদী বালিও প্লাবনে খাঁ খাঁ
হাঁ-মুখে হোঁচট খেয়ে পাতাল-পতনে দ্রুত নিয়ে যাও প্রীতি স্মৃতি, কখন বিস্মৃতি

তিনি যেন এখানে ছিলেন, তাঁর শীর্ণ দেহে জ্বলে উঠত ভারতবর্ষের অভিমান,
দুঃখ বজ্র হতো—
শূন্য গ্রাম, দগ্ধভাল মাঠে
দিনগুলি দৌড়ে যেত প্রলয়পয়োধি জলে, ইতিহাস দ্রুত নৌকা, নদী
ছলাৎচ্ছলে,
তিনি যেন নদীর পাড়ের ভাঙা মসজিদে আজান, উষাউন্মীলনে লোকচলাচলে
শান্তপথ
এখন চশমায় তাঁর ধূলো, কেউ মুছে দেয় না, ট্যাকের ঘড়িটি থেমে আছে
মৃত আমেদাবাদের হৃদপিণ্ডে,
ঐ তিনি গোলাপবিথার থেকে, তর্পণে নামেন রাজঘাটে

এবং তাঁরই নদী সবরমতী আ রে অশ্রুমতী লজ্জাহীনা নগ্ন ধর্ষণের বিকৃত স্বপ্নাটে
মানুষের অপমান বহে যাও—যা কেবল অশ্রু স্বেদ রক্তের লবণে তপ্ত জল
স্মৃতাকলে বিষাদপ্রতিমা গাঁথে নক্সিকাঁথা দুঃখের সূতায়
নিহত পুরুষ-নারী আগামী ভারত যেন মৃত শিশু দুজনের মধ্যে নিয়ে
নদীর ছলছলে শুয়ে, স্বপ্নের বিভ্রমে নড়ে, কথা কয়
সে-কি তুলে ধরে ঢেউ, আরব সমুদ্রবাহী মেঘ,
মেঘে বিদ্যুতে হিম্মত ?

৩৩. বর্ণপরিচয়

দেউরির সামনে টুলে মস্ত গোঁফ উর্দি ও নিষেধ
একটি-দুটি নীল বাস উড়ে আসছে, ছুঁয়ে যাচ্ছে
হাওয়ায় শ্যাম্পুর হাল্কা গোলাপ বা ল্যাভেণ্ডার, যুঁই,
এবং স্বর্গের ভাষা জলের উপরে জলপাতে
এবং মার্বেল সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে দ্রুত স্যাচেল টিফিন বাক্সে
মায়েদের স্ট্যাটাস সিম্বল হয়ে পরীদের শিশু
বাবাদের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যয় হয়ে
ভারতের ভাবী শাসকেরা

দেউরির অনেক বাইরে বুকে চেপে ভাঙা শ্লেট বর্ণপরিচয়
তালিমারা ছেঁড়া প্যাণ্ট, বুকের বোতামহীন শস্তা শার্ট ঠেলে ওঠা
পাঁজর কণ্ঠায় এক শিশু
এই সব দেবদূতদের দেখে
এই সব ভবিষ্যৎ প্রভু প্রভুপত্নীদের দেখে
চিনে নিচ্ছে বর্ণপরিচয়

প্রাসাদ ও বস্তি নিয়ে
প্রাচুর্য ও ক্ষুধা নিয়ে
দেউরির ভিতরে বাইরে বয়ে যাচ্ছে একটাই কলকাতা

খোকা, তোর আরো ঢের মন দিয়ে বর্ণপরিচয় শেখা চাই
খোকা তোর ভাঙা স্লেটে, আঁকাবাঁকা অক্ষরের ঢঙে
মহাদেশ মহাসাগরের নক্সা
মহাবিশ্ব সৌরলোক,
ফসলে ও যন্ত্রে, পাখি, নদীর কাকলি নিয়ে
গোটা মানুষের ছবি ফুটে ওঠা চাই

আমার তো চলে গেল ত্রস্ত দিন লাঙলের বাঁটে হাত রেখে
আমার তো বয়ে যায় ভরা বেলা যন্ত্রের পাঞ্জায় হাত রেখে
আমার তো পদপাতে পিচের গরম চুমা
অনাবৃষ্টি, উচ্ছেদ বা ছাঁটাই মিছিলে

খোকা, তোকে জানতে হবে
পৃথিবীটা বদলে দিতে কতখানি ধৈর্য পেতে হয়
খোকা, তোকে আমাদের সময়ের সমুদ্র মন্থন করে
কেশর বাঁহাতে ধরে বশ মানাতে হবে উচ্চৈঃশ্রবা

না, কোনো আপিস-ঘরে টাই-প্যান্টে জরদগব দন্ত নয়
তোকে নিতে হবে এই সসাগরা ধরিত্রীর
কঠিন দায়িত্ব, শান্তি সমৃদ্ধির দায়

এখনি সময়, খোকা, ভালো করে শেখ
এখনি সময়, খোকা, ভালো করে চোখ মেলে দেখ
এখন সময়, খোকা, তোর বর্ণপরিচয়ে
আমাদের স্বপ্ন, ভাবীকাল ॥

শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২)

৩৪. আত্মঘাত

এখানে আমাকে তুমি কিসের দীক্ষায় রেখে গেছ ?
এ কোন্ জগৎ আজ গড়ে দিতে চাও চারদিকে ?
এ তো আমাদের কোনো যোগ্য ভূমি নয়, এর গায়ে
সোনার ঝলক দেখে আমাদের চোখ যাবে পুড়ে !
বুঝি না কখনো ঠিক এরা কোন্ নিজের ভাষায়
কথা কয়, গান গায়, কী ভাষায় হেসে ওঠে এরা
পিষে ধরে আমাদের গ্রামীণ নিশ্বাস, সজলতা,
কী ভাষায় আমাদের একান্ত বাঁচাও হলো পাপ।
আমার ভাইয়ের মুখ মনে পড়ে। গ্রামের অশথ
মনে পড়ে। তাকে আর এনো না কখনো এইখানে।
এইখানে এলে তার হৃদয় পাণ্ডুর হয়ে যাবে
এইখানে এলে তার বিশ্বাস বধির হয়ে যাবে
বুকের ভিতরে শুধু ক্ষত দেবে রাত্রির খোয়াই।
আমার পৃথিবী নয় এইসব ছাতিম শিরীষ
সব ফেলে যাব বলে প্রস্তুত হয়েছি, শুধু জেনো
আমার বিশ্বাস আজও কিছু বেঁচে আছে, তাই হব
পঁচিশে বৈশাখ কিংবা বাইশে শ্রাবণে আত্মঘাতী।

৩৫. বাস্তু

আজকাল বনে কোনো মানুষ থাকে না,
কলকাতায় থাকে।
আমার মেয়েকে ওরা চুরি করে নিয়েছিল
জবার পোশাকে।
কিন্তু আমি দোষ দেব কাকে ?

শুধু ওই যুবকের মুখখানি মনে পড়ে ম্লান,
প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ও কেন গলির কানা বাঁকে
এখনো প্রতীক্ষা করে তাকে।

সব আজ কলকাতায়, কিন্তু আমি দোষ দেব কাকে ?

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩)

৩৬. মুহূর্তে বিঁধেছে তাই শর

"উমত সবরো গরুআ রোষে।
গিরিবর-সিহর-সন্ধি পইসন্তে লোড়িব কইসে ॥"

শবরপাদ

কি ভয় ? তুমি তো আছো সহজ সুন্দরী পাশে তার
তোমার প্রেমের বার্যে মত্ত সে শবর, অভিযাত্রী
গিরিসন্ধি পার হয়ে চলেছে অরণ্য অন্ধকারে,
বুকে তার স্ফীতশ্বাস স্তম্ভিত প্রলয় ঢেউ নদী
কবোষ্ণ প্রাণের মাটি উষ্ণ রক্ত ফুলে ফুলে ওঠে ;
শৌর্য তার পরাক্রম
অমিত সাহস বুকে শবরীর প্রেম
সৃষ্টির রহস্যভেদী অব্যর্থ বাণের
সে রাখে সন্ধান।

মুহূর্তে বিঁধেছে তাই শর
আপনার বক্ষদীর্ণ বজ্রঅস্থি অন্তরে কালের.
বাণীবদ্ধ কণ্ঠস্বর যেন তার
বিদ্যুৎ রেখায় দীপ্ত দৃশ্যপটে আঁকা—
গতিহারা বাণবিদ্ধ ধাবমান মৃগ
বহমান জীবন যন্ত্রণা মূর্তছবি মুহূর্তের
অনন্ত কালের বুকে অন্ধকার টুটে
ফুটে ওঠা সূর্যমুখী।

উন্মত্ত শবর সেই
বিষাদ আনন্দে যার মুগ্ধ চোখ মেলে
বুকে তার সৃষ্টি সুখ নাচে সমুদ্দুর।

রবীন সুর

৩৭. প্রণোদিত প্রজনন

সমুদ্র জলের শাড়ি খুলে রেখে বাদামী ত্বকের জুনপুট —
নগ্নতায় শুয়ে আছে যতোদূর পৌরুষ পৌছোয়। তীব্রতম
অ্যালকোহল রোদ্দুরের নেশাগ্রস্ত দক্ষিণের ঘরফেরা হাওয়া
যেনবা পেয়েছে খুঁজে এলোকেশী ঝাউ গোপা ভাঙা
আদিম উর্বর নারী, যাকে সে অনন্তকাল অহোরাত্র বেঘোরে খুঁজেছে।

খাঁ-খাঁ শূন্য উদোম দেহের চর, ইতিউতি ছড়ানো নৌকোর
পেটে কোনো জল নেই, মেদহীন শুকনো ডাঙা তবু তার নিশ্চল আহ্লাদ
ওঁচানো নোঙর গেঁথে নাভিকেন্দ্র মৌচাকের মধু পেয়ে গেছে,
আদিগন্ত বেলাভূমি উত্তররতির স্তব্ধ দৃশ্যময় ঢেউ-শিহরণ
পাথরপ্রতিম চিত্র, শরীরের মধ্যে এক নির্মিতির শরীর পেয়েছে।

পোয়াতি চিন্তার শব্দ যতো ছিল শুশ্রূষায় আকাশ উপুড়
নৈঃশব্দ্যের গান হয়ে বেজে যাচ্ছে মিলনের শান্তি ও কল্যাণে,
কাজু বাদামের ঝোপ, ঝাঁকড়া কুল। ঠেসমূলে উদগ্র কেয়ার
ধারালো যৌবনে যেন জমে গেছে পৃথিবীর সব ক্লোরোফিল—
ছড়ানো পায়ের পাতা জলপরী, নখে নখে ঝিনুকের স্তৃপ্তি দর্পণ।

সিন্ধুর অদূরবর্তী লোকালয়ে গোষ্পদের নগণ্য পুকুর:
মৎস্য প্রকল্পের চাষ, খামারের ঘেরাটোপ কচুরিপানার নক্সা কাঁথা
ভ্রূণের আঁতুড়ঘর। কুঁচো চিংড়ি, কুঁজো ভেঁটকি, পমফ্রেট, বোয়াল
শব্দ অশব্দের যৌগে কিছু ছায়া কিছু আলো বোঝা না বোঝার
ব্যঞ্জিত সঙ্গম সিদ্ধি, অভিধান ভেঙে চুরে অন্য এক শঙ্কর পার্বতী।

বাদল ভট্টাচার্য (১৯৩৪)

৩৮. ঘরের মধ্যে অনন্য ঘর

থাকতে চাই আটকে চাবি বুকের ঘরে
যখন ঝড় দাপিয়ে বেড়ায় দিগদিগন্ত ;
একলা অবাক অনন্য সেই প্রতিচ্ছবি
আঁকতে চাই চার দেয়ালে গভীর করে।

বাঁচতে চাই একলা আমি আমায় নিয়ে
অনন্তকাল সেই খেলাটি খেলতে চাই ;
বুকের পদ্মে আড়াল করা নাল চাবিটি
কোন আঁচলে বাঁধতে পারি হৃদয় দিয়ে।

ভুলতে চাই দুঃখ দহন-ব্যথার কাঁটা
দুঃস্থ শহর চৈত্রদিনের চিত্রাবলী ;
ভুলের প্রাচীর বাড়ছে বড়ো অনন্যোপায়
ভেতরবার সব দরোজায় কুলুপ আঁটা।

বলতে গেলে বলতে হয় সেই কথাটি
শেষ গেলে কি শেষ দেখা যায় দূর সীমানা
মায়ের মতো ছিন্ন কাঁথার মুগ্ধ প্রহর
জড়িয়ে থাকে ঘরের গন্ধ—অমল মাটি !

বুকের ভেতর অশেষ কিছু পরিপাটি
রাখতে চাই চার দেওয়ালে যত্ন করে ;
কৃষ্ণচূড়ার লাল হোলিতে জীবন যেন
ঘরের মধ্যে অনন্য ঘর—জীয়ন কাঠি !

৩৯. দৃশ্যের গভীরে

এখন সমস্ত সুখ অন্ধকার অতীত বিস্মৃতি,
এখন সমস্ত পথ ছন্দহীন নিস্তেজ নীরব ;
চতুর্দিকে শুধু এক সময়ের ভ্রান্ত অবয়ব
সম্মোহনে কাছে থাকে, মুখ দেখে···
বেলা যায় অন্তহীন দুঃখের গভীরে।

অথচ তখন ছিলো সেই সব মুক্ত দিন
রঙে রসে পরিপূর্ণ হৃদয়ের উজ্জ্বল ক্যানভাসে
বড় বেশি অন্তরঙ্গ বহতা নদীর মত
আজও যেন সেইসব হিরন্ময় দিন—সময় বিভূতি
ঝরে পড়ে অহর্নিশ হৃদয়ের শুদ্ধ অনুভবে।

এখন সমস্ত নদী কলুষিত হলুদ বিভ্রম,
পায়ে পায়ে ধ্বংস-বীজ ছড়িয়ে সতত
মন্দাক্রান্তা হেঁটে যায় সময়ের কুটিল নিয়মে ;
স্থল জল অন্তরীক্ষে বেজে ওঠে আর্ত হাহাকারে
অসম্ভব খরার প্রহর ;
বুকের দ্রাঘিমা জুড়ে প্রলম্বিত শুষ্ক হাওয়া
শুষে নেয় মেদমজ্জা
পৃথিবীর সর্বশেষ প্রশস্ত প্রান্তর।

কখন হারিয়ে গেছে দু-চোখের স্নিগ্ধ ছায়া
মোহময় মধুঋতু মাটির আশ্রয় ;
কলকা পাড় শাড়ি ও সিঁদুরে
প্রতিক্ষণ নম্র পায়ে হেঁটে যায় মা আমার
স্মৃতিগন্ধী দৃশ্য থেকে দৃশ্যের গভীরে।

অমিতাভ দাশগুপ্ত (১৯৩৫)

৪০. এখন গোধূলি লগ্ন, এখন বিবাহ

এখন গোধূলি লগ্ন, এখন বিবাহ।
সময় মৃদঙ্গে, মেঘে গুরু গুরু,
নীল আলো অরণ্য-শিখরে
আলো জলতলে ত্রিকাল-শিলায়—
বিবাহে চলেছে বিলোচন।

এখানে দাঁড়াও।
দ্যাখো—এই মাটি তোমার ভায়ের
রক্তে, শ্রমে মাখামাখি,
মায়ের দুধের মতো ফিনিকে ফিনিকে ওঠা ধান,
এই নদী
মহানিম, আদিষ্ট, মগ্ন পাকুড়ের
জটায় মেঘের বাসা বুকে নিয়ে বহতা আবেগে,
এই দেশ
গৈরিক-সবুজ
পাশাপাশি ঘনমিশ
পড়োশীর উত্তাপে, আবেশে,
এখানে দাঁড়াও—এই মাটি, স্বচ্ছ বহমান নদী,
স্বপ্ন, গাঢ় ভালবাসা অশ্রুতে নিবিড়
আবহমানের বাংলাদেশ।

ডেকোনা প্রচ্ছায়া-ঘন ডালপালা আকর্ষি ছড়িয়ে
আমি যাই
দিনশেষে রক্তিম মুকুল ফোটাবে রয়েছো বসে
যাই আমি যাই
আয়তনবতী হয়ে ঈশানে নৈঋতে উৎস পরিণামে
দু-আঁখি পাগল করা মানুষের পায়ে পায়ে

কাঁধে কাঁধ ঘষে যাওয়া বিদ্যুতে প্রদাহে
বুকের বাঁ-দিকে ঘন আঁতের ওপর হাত চেপে
অমন করে কি ডাক দিতে আছে—
যাই আমি যাই।

হে পরাণ-বঁধু ভালোবাসা
গাঢ় দীর্ঘিকার চেয়ে অতল চোখের ভাষা জানো
শব্দ করো নাকো
তুমুল আবেগ
নেমেছে পাহাড় থেকে ঢল হয়ে
তুমুল আবেগ
চলেছে জংশন থেকে খরস্রোতা রাঙা পথ হয়ে
কৈবর্তের জাল-ফেলা দাওয়ার ওপর
সে শুয়ে রয়েছে মাজা, চকচকে ইলিশের আঁশে
গোহালে ধুনোর ঝিম-ধরা গন্ধে
ত্রিনাথের মেলায় বাউল-মুর্শেদের
লোক-বিভঙ্গের ঠামে,
উজ্জ্বল শস্যের ধারে শান-পরা হাঁসুয়ায়--
শব্দ করো নাকো।

কে থামাতে পারে ?
যখন দাঁড়াও তুমি উলিঝুলি আঙরাখা ছেড়ে
ভুবনমোহিনী রাজরাজেশ্বরী,
আহা দেখি নাই, এত রূপ বুঝি জন্মে দেখিব না,
তোমাতে মিলায় তৃষ্ণা, পারাপার,
রাতুল বরণ পাটে তোমার অলক্ত-রাঙা পা দুখানি
পড়ে কি পড়ে না,
উথল বুকের দুধে দগ্ধশেষ গহিন শিকড়ে
রসের ভিয়ান গড়ো,
বাঁজা গাছে গুপ্তঘাতকের অস্ত্রে ঝলকে ঝলকে

শোণিতে রাঙাও চাপ চাপ কুসুমের কাতরতা,
এখন সমস্ত ঘর ভদ্রাসন, উঠোন আঙিনা
ও বিশাল ভ্রূভঙ্গের টানে
চলেছে ত্রিস্রোতা হয়ে—
কে কাকে থামাবে ?

আঁকা-বাঁকা নদী তুমি মানুষের সীমা দিয়ে বহে যেতে যেতে
ঘরে ঘরে ডাক দাও,
উৎসবে ব্যাসনে চণ্ডভৈরবের উদাস শ্মশানে
প্রতিধ্বনি ফিরে আসে
সামাল আছো হে
রাঙামাটি রুক্ষরাঢ় ক্ষ্যাপাজলবিভাজিকা-জড়ানো দক্ষিণ
বঙ্গহৃদি কলকাতা
উত্তরে আয়ত পৌণ্ড্রবর্ধনের পাথর-প্রতিমা
সামাল আছো হে
এখনই অর্জুন উইলো দেবদারু পয়েন্টিসিমা-র
শিখরে লাফিয়ে উঠবে নাড়ি-ছেঁড়া চাঁদ
কড়্কড়্ অস্থি-পঞ্জরের 'পরে খেলা হবে পাশা—
সামাল আছো হে।

তোমার ঘাড়ের পাশে গর্জিয়ে উঠবে আততায়ীর উল্লাস—
টাঙি পাশে রেখো।
বাঁশ-ঝাড়ে কুড়ুলের শব্দ জাগে—তুমি কি শুনেছো ?
পাড়ায় পাড়ায় এই ধূমার্দ্র-লোচন রাতে
মহল্লায় টারিতে টারিতে
বাবুপাড়া আগুরিপাড়ায়
যথাযথ নিমন্ত্রণ হয়েছে জানানো ?
আনো তবে ফুলভার
আনো দীপ্র কেউর-কুঙ্কুম

সাজাও রোমাঞ্চে প্রেমে
আ-মরি বাঙলার মুখখানি ;
এতদিনে, এমন মাহেন্দ্র-লগ্নে
তোমাদের ঘরের দাওয়ায়
শিস-ওঠা-লণ্ঠনের থরথর. নরম ছায়ায়
মাঙ্গলিক সূত্র হাতে
দখলি চরের মতো নতুন মুখের টানে
বিবাহে চলেছে বিলোচন।

পবিত্র অধিকারী (১৯৩৫)

৪১. **চকবন্দী জল**

চকবন্দী জল ঘোরে ফেরে শুধু চোখের সুমুখে
জলের দর্পণে মুখ, জঙ্ঘা, সানুদেশ বাতাসার লুপ
পরবর্ত্তী স্টেশনের জন্য তবু ঘণ্টা বাজে
লাল আলো মুখে নিয়ে
গতিভঙ্গে আবার দাঁড়ায় প্যাসেঞ্জার ট্রেন
শ্বাপদ সংকুল বন
দুই দিকে কশাড় জঙ্গল
সমস্ত শরীর ডাকে
মুহূর্মুহু ভোরের আওয়াজে
ফের সেই চকবন্দী জল
জলের দর্পণে ফোটে রোমাঞ্চিত নগ্ন সানুদেশ
আরেক প্রবাহ।

৪২. **বাঁচাতে পারেনা**

গ্রহণ ও বর্জনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা
আমিত্বের জট
মাঝে মাঝেই নির্জন করে দেয় আমাকে

শিলান্যাসে ঝাঁঝি শেওলা দামে
আমার উত্তরাধিকার খুঁজতে খুঁজতে বেলা গেল
হাতের তালুতে রোদ শুকোতে না শুকোতেই
ছুটি শেষ
ঝুরি বটে শীতার্ত সময় থিতু হয়ে বসে

গ্রহণ ও বর্জনের ফাঁকে আমি
কালকের ভয়ংকর চাপের ভিতর
মূল্যবোধের সাদাকালো ছক্কাপাঞ্জা খেলতে খেলতে
জিতে নিতে চাই পৃথিবীর আয়ুষ্কাল

সীমার মুঠোয় ধরা আমার রক্ষাকবচ
আমার পিতামহের অহংকার
আমাকে কিছুতেই বাঁচাতে পারেনা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (১৯৩৫)

৪৩. বাংলাদেশ থেকে

বাংলাদেশ থেকে আমি উড়িয়েছি হাঁস,
নদীকে বলেছি সাগরসিনানে যেতে যেতে বারোমাস
মানুষের ক্ষেতে কিছু জল দিও
শস্য শেষ হলে দূর শিশির থমকানো মাঠে
আমি পাঠিয়েছিলাম কিছু খুদকুঁড়োর ইঁদুর,
আকাশে নতুন পাখসাটে
ওড়ে কার উপমা হারানো পাখি,
নয়ানজুলির জলে, কই চাঁদা সরপুঁটিদের আমিই কি
শিখিয়েছি ফূর্তির দৌড়
—আমি তোমাদেব অচেনা জনমজুর।

এখন আমার নিজেরই কোনো নেই দ্রব্যভার
ক্ষুধা থেকে এখন নতুন ক্রোধ পাইনাতো আর।
আমার মানুষ ছায়া কখনো ইঁদুর হয়
কখনো বা পাখি,
আমি ভয়ে আকাশে তাকিয়ে থাকি,
আমার ওড়ানো হাঁস
ডানা মেলা অভিশাপ নাকি।

৪৪. কাক

ঐ কাকটিকে ছাখো, একবার নিচু নর্দমায়
অন্যবার সমুন্নত বকুলগন্ধের পাশে।
এটা কি সম্ভব শুধু ডানা আছে বলে?
মাটি গাছ ও আকাশ
এই তিন অফুরান অজানাকে জানতে যত
করি পরিশ্রম,
এ কালো অবাক পাখি
কি সহজে তার বহুগুণ বেশী ইঙ্গিত শিখেছে।
আমার বয়সে আজ কাকই শুধু কাছে আসে, শব্দের উচ্ছিষ্ট খায়
মনে হয় আর কোনো পাখি মানুষের এত কাছে
আসেনা কখনো। তাই কি হিন্দুর পিণ্ডে
কাকের প্রথম অধিকার ''নমঃ কাকায় কাকাপুরুষায়
বায়সায় মহাত্মন নমঃ''—মনে হয় মর্তেই রয়েছে তার
স্বর্গের মহৎ অধিকার।

আমি রোজ যত কালো চিনি তার বহু বেশী অনাথ আঁধার
এ পাখি শিখেছে বলে এক-আকাশ রাত্রি সরিয়ে
সূর্যকে সেইতো রোজ ঠেলে তুলে দেয় পূবে। আমি আজকাল
কাকের কথাই খুব মনযোগে ভাবি
তার নর্দমা ছলনা, তার বৃক্ষসংসার ভরা কুসুমবিলাস, তার

ডানাময় মেঘের সম্পদ লক্ষ্য করি,
আর কোনো বিহঙ্গবিভ্রম
এ পিণ্ডপ্রার্থী বয়সে মানাবেনা।

সত্য গুহ (১৯৩৫)

৪৫. এ আমার আমি একা নই

কে বলে নিঃসঙ্গ আমি
চোখ বুঁজি
সংখ্যাগণনাহীন সত্য গুহ ভীড় করে আসে
কারুর খুব কচিকচি মুখ—মুখে একটা ঐশ্বরিক বিভা
কেউ বা ডানপিটে খুব—দারুণ দুরন্ত
চোখেমুখে কথা কয়
কেউ সেবাদলের সদস্য, তুখোর খেলোয়াড়
কারুর বা উদ্বেলিত মুষ্টিবদ্ধ হাত
আকাশে দাপড়ায়
চায়
দেহে মনে মেধায় মানুষের মুক্তি
আর কারুর অস্তিত্বটাই প্রেম
(ব্যাপকার্থে এবং ব্যক্তিগত সংকীর্ণ একান্তার্থে)
স্মৃতি, গতি, স্বপ্ন
আনন্দ বিষাদ উচ্ছলতা
কৃতি ও সংস্কৃতি
—এই ধারায় নিজেকে নানাখানা ক'রে রাখা
সত্য গুহ টু দ্য পাওয়ার ইনফিনিটি
এবং তারা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে সারাক্ষণ
আমার মনে হয়
এক অনন্ত মাথা ভরা ময়দানে
আমি কেবল শুনে যাচ্ছি একটিই মাত্র ধ্বনি : 'ওঁ'

আমি মুখে গ্রাস তুলি
মনে হয় এক স্রোত হাত (মা মাখানো হাতখানা যেন)
আমি জামাটা গায়ে দিতে যাই
মনে হয় সংখ্যাগণনাতীত হাত আমাকে আদর করে
আমার সকল প্রয়োজন পরিশ্রম ক্লান্তি ও আনন্দে
সবাই সত্যগুহ
থেকেছে থাকে এবং প্রত্যয় তারা থাকবেও

আমি একা একা থাকতে পারিনা এবং থাকিও না
সত্যগুহরা ছাড়া যে আমার স্বপ্নে
সেই স্বাধীনতার শরীর ও সত্তার সঙ্গে মিশে যেতে না পারার যে দুঃখ
সেটা কেউ ভাগ করে নেয়না বলেই
আমাকে কিছুটা ক্লান্ত লাগে
নইলে বেশ আছি
যারা ধান করে গান করে ধূলো জলে বিচিত্র যে মানুষ
তারা, সেই সত্যগুহরা
আমাকে একাকী স্বর্গে যেতেও দেবেনা
আমি জানি
সমবেত কণ্ঠে আমাকে একটি গানই গেয়ে যেতে হবে
—'ওঁ'

একা থাকার উপায় কি
আমি কখনো নিঃসঙ্গ থাকি না ॥

তরুণ সেন

৪৬. ভুবনডাঙ্গার মেয়ে

ধান ভানা কবে শেষ। ত্রাণ ও শিবের গীত আজও তার রক্তে হানা দেয়
ভুবনডাঙ্গার মেয়ে উরুসন্ধি, মরামাস খোঁটে এসে মার্কাস স্কোয়ারে
কলসীকানার প্রেম ক্বচিৎ উৎপন্ন দেখে ডাস্টবিনের অন্নের দানায়
পৌর মহিমায় তার দিন বড়ো অফুরান, প্রচ্ছন্ন পৌরুষ মধ্যরাতে

খানিক তফাতে তার, বিধ্বস্ত কৌপীন কার কেঁপে ওঠে শরীরের বাসে
ব্যারের স্তনমূলে আলো যাদুকরীদের যৌবন কাঁপায়

মাটি ও লাঠির টান রক্তে ছিল—আজও কাপালিক
আরক্ত ত্রিভুজ থেকে উঠে যায় স্বয়ম্বর স্বেচ্ছা উদাসীন
নাভিমূলে অলৌকিক মন্ত্র রাখে যথা কিম্বদন্তীর তান্ত্রিক
ক্ষুধা গূঢ় অভিজ্ঞান দেয় তাকে প্রতারক নির্জন মুদ্রায়

ময়দানে ক্লান্তির বেলা রামধনু আঁকে রোজ সম্প্রদায় চিহ্নিত নিজ্ঞানে
যেহেতু সংযুক্ত থাকা আমাদের রক্তে ছিল দায়।

উত্তর বসু (১৯৩৬)

৪৭. ভালোবাসা অভিমুখে শব্দ শোভাযাত্রা : তের

আনম্র ফলনশীলতা শুয়ে আছে
বুকের উপরে হাত রেখে
ক্লান্তির নরম হাতে নিজস্ব সমস্ত কিছুই
প্রশান্তি জড়ানো, এক্ষুণি কারো সর্বস্বাঙ্গ
মুদ্রিত চোখের পাতায় ফুঁ দিয়ে
হাসানো যায়
হাসির জন্যেই তৈরী থাকে এমন যে কেউ
বলে দিতে পারে আপাত অবস্থান সূচা
চোখ না খুলেই পরিপার্শ্ব
রক্তেই আমার শরীর যদি
রক্তেই চোখ কান ভাবনা স্বপ্ন ছাখা
বয়ে গেলে মোহানার মুখে
ঢেউ নেই
ঢেউ শুধু চঞ্চলতা বাহির শরীরে
স্থির যা কিছু
নিয়ে আসে ক্লান্তির নরম হাত

৪৮. অনির্বাণ স্বীকারোক্তি : তিন

তোমার জন্যে জেগে জেগে রাত পোহালো
অথচ কী অনায়াসেই বলতে পারলে—
জেগে থাকতে বলিনি তো

কে কার জন্যে জেগে থাকে
জেনে শুনে জাগতে হবে এমন কোন
কথা আছে

এ সত্য তো তুমিও বোঝো, তুমিও জানো
জীবন মানেই জেগে থাকা
জেগে থাকতে কেউ বলে না
বুকের মধ্যে মানুষ যেমন জেগে থাকে

অথচ কী অনায়াসেই বলতে পারো
জেগে থাকতে বলিনি তো

তুমি কিন্তু জেগেই ছিলে আমার কাছে

রত্নেশ্বর হাজরা (১৯৩৬)

৪৯. প্রকৃতি যা তাই

তুমি আর কিছু নও
নিজেকে যা গড়ো তুমি তাই—
নদী হলে শুধু নদী সমুদ্র না দীঘিও না
চাঁপা হয়ে গড়ে উঠলে মল্লিকা না রজনীগন্ধাও কিন্তু নও—
গাছ হলে গাছ ছায়া হলে ছায়া সুখ হলে সুখ ।
উষ্ণ হবে লাল হবে প্রবাহিত আমাকে বাঁচাবে

না হলে তোমাকে কেন রক্ত বলবো ?
আমাকে না দগ্ধ করলে অগ্নি নও হিম—

কেউ আর কিছু নয় নিজেকে যা গড়ে নিজে তাই—
তিনি তো ধূলোর মধ্যে বসেও সম্রাট
কেউ বিষ কেউ শুধু বিশল্যকরণী
ওকে তো কেবল ক্ষমা হতে দেখলাম।
অর্থাৎ নিজেকে যেমনি গড়ে তুলবে তাই—
নীল হলে নীল তাপ হলে তাপ শোক হলে শোক
আর যদি প্রাণ হয়ে গড়ে ওঠো প্রাণ-ই বলবো
মৃত্যু নয় অমৃত-ও না।

৫০. তেষ্টা পাচ্ছে

পা থেকে এই পাথর দুটো খুলে দিন না
একটুখানি হাঁটি
কাঁকরগুলো সরিয়ে দেবেন ! তলায় দেখব
আমার চেনা মাটি—!
আড়ালটাকে ফেলে দিয়ে
খুলে দিন না খাঁচার দরজাটাকে
একটুখানি দেখব আমার বাড়ি
এখন কারা নিলাম ডেকে বিকিয়ে দিচ্ছে কাকে।

বাইরে গিয়ে একটুখানি দেখতে দেবেন
মানুষটাকে প্রাচীন
রাস্তা দিয়ে গঞ্জে যাচ্ছে কারা, শোধ করে কে ফিরছে বেবাক ঋণ !
সংস্কার তো উড়িয়ে দিলাম—তা সত্ত্বেও
রোজ সকালে পালক পড়ে থাকে

নোঙর তোলার শব্দ শুনছি রোজ
দেখতে একটু দেবেন জাহাজটাকে।

দেয়াল থেকে কয়েকটা ইট ভেঙে দিন না—দেখি
কোমল এবং রুক্ষ
বিষাদ খুঁজে বেড়াচ্ছে কার সুখ
কোনটা বেশি রহস্যময়   অহং নাকি দুঃখ।
বৃক্ষে কখন বিষাদ থাকে
সবুজ—কিংবা যখন পাকে ফল
পা থেকে এই পাথর দুটো খুলে ফেলে
বন্ধ কলটা খুলে দিন না—আমি
একটু খাব জল ··

সামসুল হক (১৯৩৬)

৫১. পুত্রকে তার পিতা

এই নাও ধরো আদিম পুত্র দুধের কলস
দুধ নয় যেন দগ্ধ মাটি-ও ইস্পাতে ভরা
ত্রিকাল-কলস যার খোঁজে গিয়ে ব্রহ্ম জেনেছি
আমার হাতে সে লুণ্ঠিত হতে প্রস্তুত ছিলো
এই নাও ধরো আদিম পুত্র দুধের কলস
শরীরের তাপে প্রস্তুত করো যজ্ঞের হবি
নিজের দেহের গরলে তৈরি আধারে জমাও
আমার জন্যে যজ্ঞ পুত্র তোমার জন্যে
তোমার পুত্র সেও আমাদের যৌথ দেয়াল
সূর্যের হাড় সে এখনো চাটে ব্রহ্ম জানেনি।

রাক্ষস থেকে যজ্ঞ-হবিকে সাবধানে রেখো
যদিও যজ্ঞ কিন্নরাদির মতো প্রীতিকর

হলুদ দাঁত ও মায়াবী নখর ব্যবহারে পটু
ধর্মকুলজ তবুও ধর্মে অবিশ্বাসী সে
জন্ম নিয়েও বিষ মেখে ছায় জীবনের ঠোঁটে
যেন পুত্রের জনক নয় সে যেন বৃদ্ধের
পুত্র নয় সে যেন মৃত্যুর শিকারী কুকুর
কচুপাতা পচাডোবায়-ছড়ানো স্বাস্থ্যও প্রিয়

জন্মতুকের সোনালি ঘাতক যজ্ঞের হবি
স্তনিত ধাতুর গন্ধের মতো যজ্ঞের হবি
রক্ষা করার সব দায়ভার তোমার পুত্র
পৃথিবী যেমন স্বর্গের দ্বারে প্রহরায় রত

দীপেন রায় ('১৯৬৭')

৫২. ইতিহাস

প্লাবনে বুকের কাছে তুলে আমাকে বাঁচিয়েছিলে
তুমি অদিতি
—সমুদ্র জননী

পঞ্চাশের মন্বন্তর হাতে ধরে পার করেছিলে
তুমি আমার মা—
সে কোন পরাক্রান্ত ইতিহাসে
মানব জন্মের সেই উত্তরণে
অসংখ্য মৃত্যুর থেকে
আনন্দ আমার।

৫৩. ক্রোধ উত্তেজনা এবং দুঃখেরা—৪

তাওয়ার রুটির মতো ভেপে ওঠা ক্রোধের
যে ভালোবাসা
তোমাকে জড়িয়ে আছে,
তার উত্তেজনা ক্রমশঃ শরীর জুড়ে
তালপাতার হাওয়ায়
কাঁপা কাঁপা গলার গান
বন্দীদের সমবেত উন্মাদনায় ছড়িয়ে পড়ছে
পাঁচিল ডিঙিয়ে।

ভিজে শাড়ার থেকে জল ঝরার মতো
মাটিকে ভিজিয়ে যে ভালোবাসা
আমাদের যৌবনের নিদ্রাকে ভাঙিয়ে
বনে-বনে-পাহাড়ে-পাহাড়ে
মানুষের ঘরের কোণায়, গোলার ভেতর
রান্নাঘরে
রক্ত ফুটানো যন্ত্রণার শিকড়ে শিকড়ে
সে-তো জীবনের জাগরণ—শিল্প তার নাম।

তিনদিনের জলঘেরা ঘরবন্দী কলকাতার
বানানো অভিজ্ঞতা
একাত্ম কি করে হবে
ঢলনামা ঘূর্ণির!—
মানুষের যে চেতনা মৃত্যুসীমা ছুঁয়ে
গাছের ডালের ওপর নির্ভরতায়
শুয়ে থাকে শিশু মা-র বুকের ওপর
ক ল কা তা কি তাকে ছুঁতে পারে!
বানভাসি অভিজ্ঞতা॥

সে-তো মৃত্যু ছুঁয়ে ফিরে আসা চেতনায়
জীবনের জাগরণ—শিল্প তার নাম।
আর এতো নিশ্চিত জীবন, শুধু পায়ে জল তার
পোষা বেড়ালের কান্না
তবু কি অসম্ভব লোভ, ছুঁতে চায় বানানো অভিজ্ঞতায়
ব্যানার খবরে—
শিল্প কি এতই সুলভ যে মৃত্যুঘাতহীন অবয়বে
ফুটে উঠবে জীবনের মুখ!
ভালোবাসা এরই নাম,
মাটি থেকে উঠে আসা গরম ভাপের মতো এই জীবন
বন্যবন্যার জল যত ছুঁয়ে যায়
মৃত্যু তাকে দিয়ে যায় স্মরণীয় শিল্পের আকার।

আমরা কি বেঁচে আছি! সে-তো বলে দেবে
ওই জল, বুকের ওপর শিশু ও সাপ
উলঙ্গ রমণী,
ওপড়ানো বটের গুঁড়ি
মাথার ওপর ঝরা বৃষ্টির নরক
আর ওই মৃতদেহ—বহুদূর থেকে শব হয়ে
ঘর ছেড়ে যে হয়েছে জলের আশ্রিত।

হে জীবন শিল্প ও প্রতিমা
মৃত্যুর মুখের জল থেকে উঠে এসে
যে পায়ে দাঁড়ালে আজ
সে-তো ওই বোধন,
ঘরে ও ঘরের ভিতরে
কলা-বৌয়ের স্নানের জল
যেমন ছড়িয়ে দেয়
সংসারের সকল কিছুতে।
কুম্ভহাড়ির মুখে তেকাটা তীরের ওপর

দর্পণে মুখ ছ্যাখে
ঘটের গামছার মতন পাট হয়ে
ওই তো জীবন—শিল্প ও প্রতিমা।

৫৪. ছায়াসমুদ্র

যে ঘুমিয়ে আছে আমি তাকেই পাহারা দিই, জেগে থাকি
মাথার পাশে, মাটিতে একা। গোপন মেরুন, জলপাই রঙে
অর্পিত বিশ্বাসের কাছে মেদুর, ছায়াসমুদ্রের মৌন :
নক্ষত্র মণ্ডলে শুয়ে দেখি দু-চোখের অপরূপ ঘুম।

হলকা রোদ, বাতাসের হালকা কাঁপায় চোখের পাতাও।
ঘরে বাইরে একা আমার সবুজ। মানুষের মৌনে গূঢ়
আলতো মেঘ শরতের কিংবা চৈত্রের কাপাস,
তাকেই পাহারা দিই যে আছে ঘুমের সমবেদনায়।

নীরেন্দু হাজরা (১৯৩৭)

৫৫. সময় পাখির মতো উড়ে যাচ্ছে

আকাশে আস্তৃত আছে শীতের বিকেল
নিস্পন্দ নিদ্রায়
ঠিক যেন শবাশনে
টেবিলে নিবদ্ধ রোগী,—ইথারে অজ্ঞান।
টোম্যাটো রঙের মতো
ওর ঠোঁটখানি
অনঢ় রক্তিম।
বরং রোদ্দুর ওকে ছেঁকে খাচ্ছে,
নারকোল পাতার ঝালর
আঘাতে জাগাতে ঝিলমিল।

কমলাফুলের ক্লান্তি মুছে যায় আমার দৃষ্টিতে—
ঘোরলাগা দুটি চোখ
ফিরে চায় কণ্ঠহার।

জীবন বিবর্ণ বেলা—অনুপুঙ্খ শুধু চেয়ে থাকা—
বিষণ্ণ নগর জন, যেন শব :
ঘটা করে চলে যায়
উত্তরে বাতাস
শব্দহীন সমকাল কাছিয়ে আনছে পত্রলেখা
নীলসন্ধ্যা,
লালদীঘি ডুবে যাচ্ছে নক্ষত্র ভবনে
আমরা বুড়িয়ে যাচ্ছি প্রতিক্ষণ, চোখের সমুখে
সময় পাখির মতো উড়ে যাচ্ছে বেগে, পাখা মেলে।

কমলেশ সেন (১৯৩৮)

৫৬. এই মাটি, মাটি বেয়ে

তুমি কি শুনতে পাচ্ছো, শুনতে পাচ্ছো আমার কথা,
আমার থরো থরো গানের, গানের কণ্ঠ
আমি গভীর, গভীর থেকে গভীরে চলে গিয়েছি,
দেখেছি, মাটির অন্ত্রে, অন্ত্রে কি ভালোবাসা,
যেখানে ঝিরঝির, ঝিরঝির জলের স্রোতে
বুজে আসে, বুজে আসে চোখের পাতা,
ঘুমে ঢলে, ঢলে, বরফের মতো গলে যায়
তিরতির স্নায়ুর, স্নায়ুর শ্বেত কণিকা।

এই মাটি, মাটি বেয়ে
মানুষ, মানুষ মাটির কতো গভীরে, গভীরে যেতে পারে।

মাটির গভীরে, গভীরে, একী মমতা, একী ভালোবাসা,
মাটির স্তরে স্তরে, একী, একী লাল নীল সবুজ বাহার !

তুমি, কি শুনতে পাচ্ছো,
লক্ষ, লক্ষ কোটি শ্রমের, শ্রমের ঝংকার,
ঝনঝন, ঝনঝন শব্দে কেঁপে ওঠে,
কেঁপে ওঠে মাটির, মাটির অযুত ভার ।

এই মাটি, মাটি বেয়ে
মানুষ, মানুষ মাটির কতো, কতো গভীরে যেতে পারে,
মাটির গভীর, গভীর থেকে তুলে আনে,
তুলে আনে, মাটির, মাটির রূপ, অরূপ ভালোবাসা !

এই মাটি, মাটি বেয়ে
মানুষ, মানুষ মাটির কতো গভীরে, গভীরে যেতে পারে

মণিভূষণ ভট্টাচার্য (১৯৩৮)

৫৭. মহালয়া

'যেহবান্ধবা বান্ধবা বা যেহঅন্যজন্মণি বান্ধবা ঃ
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিন ঃ ।।

আজ শুধু তর্পণের দিন । আজ পূর্বপুরুষের
প্রথিত স্মৃতির প্রতি উচ্চারিত কয়েক গণ্ডূষ ।
এখন ভাঁটার টানে বলরাম সরকারের ঘাটে
শেষ সিঁড়ি জেগে ওঠে, গজানো ইটের খোপে খোপে
শ্যাওলা, পিছল পলি ; ঘোলা জল বেঁকে চুরে যায়
অঢেল ভাসন্ত কুশে, ঘোলা জল ছত্রভঙ্গ শিরায় শোণিতে
কিছু কিছু বিপত্তি ঘটায় ।

প্রথমে তুমিই এসো, আমাদের আদি পিতামহ—
যথানামে এই পিণ্ড তোমাকে দিলাম।
প্রপিতামহের চেয়ে তুমি ছিলে কত দীর্ঘকাল
বিবর্ণ আসবাবপত্রে বাঘছালে তোরঙ্গে তৈজসে
এখনো দেহের গন্ধ ইতস্তত জড়ানো রয়েছে,
ঝুলকালি তোমাদের যথোচিত অনিষ্ট করেনি।
অথচ ব্যাপক স্রোতে ধ্বসে যায় নৈসর্গিক অয়েলপেন্টিং—
সুদূর বল্লাল সেন, ক্ষিপ্র ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি
বাণিজ্যে অস্থির, কিন্তু তোমাদের পদযাত্রাখানি
ধূলায় ধূসর কোন তীর্থোপলক্ষ্যের দিকে জেগে
শস্যের ভিতর থেকে অপরাহ্ন গড়েছে, তখনো
লোমশ কবজির নিচে লুণ্ঠনের বিস্ময়ের ঘোর।

তুমি এসো পিতামহ, প্রপিতামহের
অন্তর্জলিযাত্রাদিনে দেখেছিলে দিকচক্রবালে
সায়াহ্নে ধুলির ঝড়ে বিহগ তৃণের দল, বৈশাখ ঝঞ্ঝায়
রজনীর কলরব, মুণ্ডিত প্রভাতে একবার
সপিণ্ডীকরণহেতু এই ঘাটে এসেছিলে তুমি
আজও সেই অপরাহ্নে তুমিও এসেছ পিতামহ
প্রপিতামহের সঙ্গে সমপিণ্ডোদকে।

কুশের বিছানা পেতে গব্যঘৃতে আতপতণ্ডুল
সযত্নে মেখেছি, তুমি বড় সুসময়ে
শিল্পোদ্ভব আমাদের বধিরতা জেনেছে যদিও —
আকাশ পাতালে তোমরা কে কে আছ, আকাশ পাতালে
আমাদের পিতৃপিতামহ,
আজ কিন্তু জাত সারে হবিষ্যান্ন ফুটেছে অধিক।

আজ কেউ আসবে না। জানতাম আসবেনা কেউ
আসার সময়ে বড় বৈকালিক ছায়ার উৎপাত,

এখন যদিও প্রাতঃকাল
তথাপি চাদরে ঢাকা প্রথমত অনিশ্চয়তার
দ্বিতীয়ত অনিশ্চয়তার
তৃতীয়ত সচেতনতার
উত্তরাধিকারসূত্রে পাঁজরে প্রোথিত ধনঘোর
আয়ুষ্কাল এখনো অধিক।

যদিও এখানে
উদ্বাস্তু সাপের চেয়ে ইঁদুরের এবং মশার
এবং মশার চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থাপনায়
উৎপাদনে সারা রাত্রি ভোর
তিমির দুয়ার খুলে সমগ্র যামিনী চলে যায়—
কোনোদিকে প্রকাশের বেদনা জাগেনি
সম্ভ্রমের বেদনা জাগেনি
সংঘর্ষের বেদনা জাগেনি
অধিকন্তু নির্বিকার প্রাচীন ভবনে
বৃহৎ বৃহৎ কিছু অয়েল পেন্টিং
এবং দুর্ধর্ষ কীর্তি, বাঁকা জল ধারালো কুশের
নির্জন তীক্ষ্ণতা নিয়ে ডুবে যায় আতপতণ্ডুল
নির্মাণ পিপাসা স্থিতি পর্যটন ব্যর্থমনে হয়।

দক্ষিণ কর্বজিতে বাম তর্জনী রেখেছি পিতামহ,
ভবিষ্যৎ পিণ্ডের প্রত্যাশী,
কিন্তু খরস্রোত এই পিছল সোপানে
ভবিষ্যৎ পিণ্ডোদকহীন।

এখন নির্ভীক জলে জোয়ারের সংগ্রাম জেগেছে
চতুর্দিকে আশ্বিনের বলবান খেয়াপারাপার,
এখন জলের নিচে বাঁকানো রৌদ্রের রেখাগুলি
কোলাহল করে, তবু ইটের কানাচে কিছু গজানো ঘাসের শিহরণ—

স্নানার্থীর দুর্বল চীৎকারে
শাস্ত্রানুমোদিত আয়োজন
আয়োজন প্রতারণাময়
আয়োজন জাহ্নবীসমান—
যেখানে আঙুল থেকে কুশের অঙ্গুরী খ'সে পড়ে এবং যেখানে
ব্যাকুল শারদ রৌদ্রে একাকার প্রবহমানতা।

রমেন আচার্য (১৯৩৮)

৫৮. স্বপ্ন ও সেফ্‌টিপিন

খস্‌খসে চামড়ার আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য
আঙুলহীন সাপ কিভাবে খোলে তার খোলস আর
সেফ্‌টিপিন।

শক্ত, প্রায় নিরেট গোলাপ কুঁড়ি তার শরীর থেকে
আলগোছে ছাড়াচ্ছে যে পাপড়ি তাতে কোন
রক্ত লেগে নেই।
আমি চাই এরকম রক্তপাতহীন অস্ত্রোপচার শিখতে। আর
সাঁতার শিখবো সুচ-সুতোর কাছ থেকে, যে সারা জীবন
কাপড়ের ঢেউয়ে ডুব-সাঁতার দিতে দিতে এগিয়ে গেছে
পারমাণবিক সভ্যতার দিকে।

কিন্তু তার আগে বহু ব্যবহৃত খোলস ছাড়া দরকার।
আঙুলহীন সাপ কি শক্ত বাকলে ঘষে ছেঁড়ে
তার জীর্ণতা!
সে কি কুঁকড়ে মুচড়ে তার প্রাত্যহিকতার খস্‌খসে খোলস ছিঁড়ে
রোদ্দুরে ঝিলিক দেওয়া নবীন ফণা তুলে বলে 'সুপ্রভাত'।

কিন্তু সেফ্‌টিপিন? যা অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্য আমরা

সাধ করে জীবনযাত্রার মধ্যে এনেছি, যা
জীবন ও সংস্কারের পথে দাঁত কামড়ে বসে আছে
তাকে ?

ক্যালেণ্ডারের মত নির্দয়ভাবে নিজেকে ছিঁড়তে ছিঁড়তে
নববর্ষের আলিঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়তে জানি না। চাই না
ব্যথিত সূচ হতে, যে সমস্ত জীবন ধরে বুনে চলেছে ফুল,
কিন্তু সুতো ছাড়া। যে পেছনে
সুতোর মত কোন পথচিহ্ন রেখে আসেনি। এমন কি
তার প্রথম ফোঁড়ের জন্ম বিন্দুকেও সে চিরকালের জন্য
হারিয়ে এসেছে এক আকাশ নক্ষত্রের মধ্যে।

সমীর রায় (১৯৩৮)

৫৯. এ বধ্যভূমি আমাদের সোনার সিংহাসন ?

আমরা কোথায় আছি ? এ বধ্যভূমি আমাদের সোনার সিংহাসন।
রুটি আর গমের থলেগুলো যখন হাল্কা হচ্ছে
কলকাতা শহর যখন মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে আছে
বাসন্তীর লাটে ক্ষুধা ছৌনাচের তাল গুনছে।
বালিগঞ্জ স্টেশনে লম্পটের পায়ের শব্দ
জননীরা পালাও, যুবতীরা তফাৎ যাও।

আমার কবিতা অভিমন্যুর তীরের ডগায় কাঁপছে।
আমার প্রতিটি স্বপ্নের সামনে রেডলাইট
অথচ আকাশে সাদা রুটির মত যত আলো দেখা যায়
তার চেয়ে বেশি আশা আমার বুকে।
দাঁত ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় প্রতিবাদ
দুঃখে শোকে ক্রোধে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল
কাঁচা কয়লার মত জ্বলছে প্রতিদিন, প্রতিমাস, প্রতিবছর।

রাবনের চিতার মাপ আমার বুকের মাপে বুঝি গড়া হয়েছিল।

আমরা কোথায় আছি ? এ বধ্যভূমি আমাদের সোনার সিংহাসন ?

অনন্ত দাশ (১৯৩৯)

৬০. রূপান্তর

তরুণ স্বপ্নে দেখা যে তোমার মুখ
ম্লান হয়ে যায় সময়ের সন্ত্রাসে
কত যে শপথ পথের ধুলায় লোটে—
মিছে সন্দেহে দেওয়াল তুলেছে মাথা

আদিজন্মের বহু বিচিত্র পথে
মানুষ পেয়েছে মানবের অধিকার
বিবর্তনের ধারাবাহিকতা ছেড়ে
এবার তবে কি উল্টাপুরাণ হবে !

আত্মজ ভেবে আদি প্রস্তর যুগে
মানুষ লড়েছে তুরপুন হাতে নিয়ে
বিংশ শতকে মহাকাশ যুগে এসে—
বৃথা যাবে সব আত্মীয় সংঘাতে ?

কোথায় মৈত্রী চেতনার উল্লাস
অন্ধকারে ডুবে আছে সব মুখ
এ তো গুহা নয়, আঁধারের শেষ সীমা
রূপান্তর কি এখান থেকেই হবে।

৬১. বেলা চলে যায়

দুঃখ আমার অগ্নিশুদ্ধ শিখা
আজীবন তাই কাটালাম সংক্ষোভে
বুকে, হাহাকারে ছুটে যায় মরীচিকা
আমি তো চাইনি ইচ্ছামৃত্যু পুণ্যের বৈভবে-

হেমিস্ফায়ারে জমে আছে কালোমেঘ
দূরে পর্বত এখনও গর্জমান
কে মাপে হাওয়ার মাতাল অশ্ববেগ
গ্রামে গ্রামে তবু শ্রেণীর দ্বন্দ্ব অপরিবর্তমান

সঞ্চয় আমি যেটুকু করেছি রাতে—
বিদুরের খুদ—শিশিরসিক্ত কণা
তাও ঝরে পড়ে প্রতিদিন সংঘাতে
রক্তে তবু তো বহন করেছি এই যুগযন্ত্রণা

মাটির গন্ধে ফিরে যাব সেই ঘরে
অনেক দিনতো কাটালাম হেলাফেলা
বহুদূর থেকে ডাকে আর্তস্বরে ;
বেলা চলে যায়, বেলা চলে যায়, বেলা চলে যায় বেলা।

আনন্দ ঘোষ হাজরা (১৯৩৯)

৬২. **মহিষ**

চল্লিশ বছর ধরে আমি শুধু ঘুরে ঘুরে দেখেছি মহিষ
পাড়াগাঁয়, মেঠোপথে, ভৌতিক বেলগাছ দুপুরের স্তব্ধতায় যেখানে দাঁড়িয়ে তার নিচে ;
সকালে দোনায় জাব জেউলির লোভে
গৃহপালিতের সাথে মিশে যায়
বড় বড় বুনো মোষ
চল্লিশ বছর ধরে নাগাড়ে দেখেছি।
গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে বাঁশ ঝোপ ফলসার বন ভেদ ক'রে
ভাঙা শিবদালানের চাতালে শুয়েছে
দারুণ ভয়ের মতো মহিষের দল—
পাথর বিদীর্ণ করে ঘুমভাঙা জ্যোৎস্নায় তারপর দারুণ ছুটেছে।
মাঠ ঘাট বাট সব ভ'রে গেছে অশান্ত মহিষে

চল্লিশ বছর ধ'রে ভয় আর ভাবনার জারজ সন্তান
আমি শুধু ভৌতিক বেল গাছ ভাঙাঘর জ্যোৎস্নায়
মদমত্ত দেখেছি মহিষ।

তার পরে, তারও খুব পরে
হিজলের বন ঘেঁসে বসতি উঠেছে
বসেছে বাজার

সারিবদ্ধ দর্জির দল
সেলাইয়ের অবিরাম শব্দগুলি
মাঝে মাঝে দু-দাঁতে কেটেছে ;
তখনও গলির পথে শব্দ ক'রে ঢুকে পড়ে মহিষের দল
পিঠে তার শুয়ে থাকে রয়স্ক বকের মত রোদ
ক্ষত খুঁটে খুঁটে খায় অবিনাশী কাক।

শিবেন চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৯)

৬৩. প্রার্থনার সুরে

প্রার্থনায় বৃক্ষ নতজানু
আমি আজো দর্পিত উল্লাস
শতকের যন্ত্রণায় ক্ষোভ দুঃখ গ্লানির ভিতরে
বক্ষদীর্ণ মহান পিতার।

রক্তে শুধু কোলাহল
মৃদঙ্গের গম্ভীর স্বনন
কে কোথা কাঁদছে ঝড়ে
কোথায় ভাঙছে ঘর আর্তনাদে নিভৃত আত্মার।

আমি আজ বড় ক্লান্ত—বড় ক্লান্ত শরীরে মননে
রক্ত—হাড়ে ব্যথার পাহাড়
নদী কি উজ্জ্বল স্রোতে ছুটে যাবে অগাধ সাগরে
প্রান্তরের দিকসীমা ব্যক্ত হবে ঘরের দু'ধার।

দ্যাখ তুই দ্যাখ চেয়ে—দ্যাখ তুই দু'চোখে তাকিয়ে
বুক ফেটে রক্ত ঝরে
আমাদের মহান পিতার
প্রার্থনায় বৃক্ষ নতজানু
মৃত্যুর ভৃংগারে মদে
আমি আজো স্পর্ধিত উল্লাস।

৬৪. খাদের গভীর থেকে

শিয়রে দাঁড়িয়ে আছো
নতমুখ
বলো, তুমি কে?

কালরাত্রে জ্যোৎস্না কেন
কেঁদে উঠেছিল?

মমতা পাইনি কারো
স্নেহ তাও নয়
ভালবাসা এখন বিস্ময়।

নত মুখ কে তুমি দাঁড়িয়ে
দুই হাতে ধরে আছো
ছিন্ন হৃৎপিণ্ড
ওটি কার?

গভীর খাদের থেকে
কে যেন চেঁচিয়ে ওঠে
'আমার, আমার'।

অজিত বসু (১৯৪০)

৬৫. **অনন্ততন্দ্রা**

ফিরে এসে দেখি, সেই সূর্য, কিন্তু আলাদা দিন। সে
কিভাবে ঘুমিয়ে ছিল? দেখি, তার জাগা-বুকের মধ্যে
আরো অনেক পর্দাটানা ঘুম। সেই পর্দা সরিয়ে সরিয়ে
এক একটি প্রকাশ্য উজ্জ্বলতা, নিভে, অন্ধকারের ভেতর
দিয়ে লুকোনো একখানি ছবি বার করে। সেই ছবিকে
অস্বীকার করে আরো এক ছবি—তার মাল্যভূষিত
বরণশাঁখের স্তিমিত ধ্বনির বুকে অন্য চলন্ত প্রদীপ্ত
জীবন্ত, ধায় কালসিন্ধুপানে—
আমি, আমার মত সহস্র লক্ষ পা—দিশাহারা ঝনঝন
ভাঙনের মধ্যে মহাসার্থকতার মগ্ন গুণ্ঠিত নিরাকার
ধ্যানমূর্তি। বাতাস চুপ—ভার নেবে না। আকাশ,
বিস্তৃত শূন্যের মধ্যে একার বিগলিত নিঃশব্দ প্রবাহ।
মাটি, তারও মুখে নিষেধতর্জনী। হারানোর পিছনে হাত
বাড়িয়ে নানান হারানো।
লক্ষ পা, লক্ষ অশ্বারোহী, আলো, অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে
টলমল মেদিনীর বুকফাটানো বিক্ষোভে শূন্য, শূন্যপরিপূর্ণ
নিশ্চিহ্নের আবরণভেদী হাহাকার, নিশ্বাসে নিশ্বাসে
নির্যাসে অভিষিক্ত!
ফিরে এসে দেখি, এগিয়ে চলেছে ঘড়ির কাঁটা! ঘুরছে
দিন রাত—আলো, অন্ধকার। রক্ত, রক্তাক্ত। রূপ ভাঙতে
ভাঙতে মৃত্যুসৌন্দর্যের রূপসী মেঘঘনঘটা—বৃষ্টি, তোলপাড়,
বজ্রছুরিকা, ভীষণের প্রলয়-কম্পন। তার পদছন্দে,
আন্দোলিত উড়ন্ত ভস্ম মহামুক্তিতে পূর্ণায়ত, বিলীয়মানতায়
কুণ্ডলিত অন্তরালস্পন্দন।
আমি কে? সে প্রশ্ন ঐখানে পাথরে জলের ছলাৎ ছলাৎ!
বার বার, বার বার ...। পাথরও বলে না, জল আয়!
জলও সেই দূরে সরে যায়। তারই মধ্য অতলে
মিলন ফুলশয্যাময়! দৃশ্যের বাহিরে অন্ধ ত্রিবিশ্বের
অনন্তনিদ্রায়!

৬৬. জাগৃতি

ডুব দিলে কে জেগে ওঠে। তখন বাহিরে অন্ধকার! ভিতরে
ঘরে নির্জন বায়বীয় আলো। হাতহীন, পা-হীন,
মস্তিষ্কহীন, স্নায়ু শিরা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে স্থির মৌনতা।
তারই মধ্যে সুর যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে জ্বালায় প্রদীপ একে একে।
দীপাবলী। আলোক, আলোকবন্যা। একটি নৃত্যপদক্ষেপে
শত লক্ষ কোটি পা তালে তালে ছন্দময়।
এ কোন্ স্থান? কার পা? নৃত্যযুক্ত সমবেত মূর্ছনায়
কে এরা? বুঝতে পারে না।
শুধু জল, শত ঢেউ অঝোরধারায় ডুবে নিঃশব্দে
বেগবতী পাতালপ্রবাহ। ঊর্ধ্বে বিরহী মেঘ, গ্রহতারা,
সূর্য চন্দ্র চক্রের ঘূর্ণ্যগতি। ব্রহ্মাণ্ড কিসের গুঞ্জনে
সজ্জিত লজ্জিত সৌন্দর্য। তার বর্ণময় কিরণ ভেঙে ভেঙে
নানা তীর—পূর্ণালোক ছিন্ন ক'রে নানা ঋজুরেখা।
দেখা, সর্বস্বহারানোর পর একা, রেণু রেণু হ'য়ে
গন্ধরংএ চূর্ণ চ্যুত অঙ্গরাগ। সেজে কে এল?
বলবে না ব'লে অন্ধকার হ'য়ে গেল।

উত্থানপদ বিজলী . (১৯৪০)

৬৭. অনুভবে অন্তরাল-নদী

সমুদ্র আমার ছিল না কখনো:
ছিল এক অন্তরাল-নদী;
দু'পাশে ধূসর ক্ষেত, বন্ধ্যা জমি—
সেখানে এমন কী যে মহারাজ হবো
স্ফীত বুকে উদ্ধত কৃপাণে।

কোথায় মৃদঙ্গ বাজে! কোথায় কে জানে?
নিভৃত গঙ্গোত্রী যেন মায়ের মুখের মতো

সুদূর শিখর থেকে
শীর্ণা স্রোতের ধারা নেমে আসে অতি সন্তর্পণে।

সমুদ্র আমার জানি ছিলনা কখনো :
ছিল এক অন্তরাল-নদী ;
বাঁশের সবুজ বনে সহজ প্রান্তরে
পুরানো বটের নিচে চেয়ে আছে শিবের মন্দির।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় (১৯৪০)

৬৮. অভিমন্যু

প্রবেশ করেছি, অথচ জানি না নিষ্ক্রমণের রাস্তা
বাবা বলেছেন : ঘুমিয়ে ছিলাম তখন মাতৃগর্ভে
(এখন যে আমি কি করি।)
ঘুমিয়ে ছিলাম, তাই জানা নেই নির্গমনের রাস্তা
বাবা বলেছেন ব্যূহ ভেদ ক'রে প্রবেশের পদ্ধতি
তখন মাতৃগর্ভের অন্ধকার মায়াঞ্জন
চোখের পাতায় বুলিয়ে দিয়েছে কানের দরজা বন্ধ
(ঘুমিয়ে ছিলাম নিয়তির নির্দেশে।)

মা, তুমি আমাকে জাগালে না কেন?
(এখন যে আমি কি করি।)
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য কৃপ অশ্বত্থামা
ঘিরেছে—চক্রব্যূহ সব দিকে, সপ্তরথী
(শিশু ব'লে কোন ক্ষমা নেই।)
গ্যাস চেম্বারে ইহুদিকে ঠেলে নাৎসী
অপরাধ জানে হিটলার জানে আইখম্যান

লড়ছি তো আমি প্রাণপণে নেই অস্ত্র

ধনুকের ছিলা, সারথী, অশ্ব, রথের চূড়া
মাটিতে লুটায়, রক্তের নদী পায়ের তলে
সূর্য এখন অস্তাচলে
নিরস্ত্র আমি (শিশু ব'লে কোন ক্ষমা নেই।)

হরিণের প্রতি করুণায় সংযত শিকারীর গুলি ?
অবশেষে তুলি রথের ভগ্ন চাকা
ঘোরাই ওড়াই ঝাঁকে ঝাঁকে তীর, সপ্তরথী
হিংস্র মুঠোয় ট্রিগারটা চেপে ধরে
(শিশু ব'লে কোন ক্ষমা নেই।)

এ যেন এসেছে জল থেতে নীল গাই
জ্যোৎস্নার ছায়া পাতায় পাতায় দীঘির জলে
শাল তাল আর তমালের বনে স্বর্গীয় নীরবতা
গুলির শব্দে বুকের রক্তে দীঘির জলের রঙ
লাল হয়, ভাসে প্রাণহীন সেই অবোধ বন্যশিশু।

বৃথা লাফালাফি, দৈত্যের হাতে শোলার পুতুল
সাধ্য কি পাই নিস্তার ?
দানবের হাত বিষাক্ত আর যোজন যোজন বিস্তার
অগস্ত্য নই, ইল্বল আর বাতাপীর দৌরাত্ম্য
খোলা আছে গ্যাস চেম্বার

প্রবেশ করেছি, জানি না নিষ্ক্রমণ
সপ্তরথীরা ঘিরে ফেলে মারমুখী
বাবা বলেছেন ঘুমিয়ে ছিলাম তখন মাতৃগর্ভে
মুক্তির পথ জানা নেই

ছিন্ন চক্র, কে দেবে আচ্ছাদন ?
(এখন যে আমি কি করি।)

৬৯. শিকড়ে যা কিছু লেগে

শিকড়ে যা কিছু লেগে, সত্তা তারই আসঙ্গে উন্মাদ
যা কিছু বিশ্লিষ্ট কোরে দিতে চায় ; তার প্রতিরোধে দাঁত নখ
জ্বলে ওঠে ; মুহূর্তেই হয়ে পড়ে ধ্বংসকামী,—মারণযজ্ঞের পুরোহিত
টেবিল চেয়ার বই ফুলদানি বিছানা বালিশ
মেয়ের রঙিন খেলনা টুকিটাকি নির্বিরোধ মমতা জড়িয়ে পড়ে থাকে
ছুঁলেই গরমভাপ লেগে সুখে বুজে আসে চোখ

'মায়া'—বলে চোখ বুজে বিপথে চলুন শঙ্কর
যে যার নিজস্ব সত্য খুঁজে নিক ; শতপুষ্প ফোটে তো ফুটুক ;
দিক্‌বিদিক
জুড়ে তার হোরিখেলা মুছে দেবে যা কিছু নশ্বর।

শিশির গুহ (১৯৪০)

৭০. বোধ ও মেধার কঠিন পাথরে

কষ্টি পাথরে আছে অদ্ভুত ম্যাজিক
ফিকে লাল হয়ে আসা বিষণ্ণ সন্ধ্যার পাখিরা যখন ফেরে
স্পষ্ট তার ছবি ভাসে কঠিন পাথরে—
তীক্ষ্ণ তূণ হাতে নিয়ে কারা প্রতীক্ষায়, কারা দেয় শান্তির শ্লোগান
সব কিছু অনুভূত নিঃশ্বাসের মতো।

সবুজ ধানের খেতে রক্তাক্ত পায়ের ছাপ, বর্শা ও বল্লমের
একত্রিত অবস্থান, তবু এক আশ্চর্য সকালে—
বীর্যবান মানুষেরা অধিকার চাই বলে মাটি থেকে এক পা সরেনি
সে-সব ছবিও আমি প্রত্যক্ষ করেছি এই কঠিন পাথরে।

লোভের তীব্রতা দেখে কারা যেন ছুঁড়েছিল একরাশ ঘৃণা
মহিমা সরব হোলে সেই পলাতক-প্রতারক সমস্ত ব্যাধেরা
অন্ধকার অন্বেষণে শকুনির নখে খোঁজে আশ্রয়ের মাটি
সব কিছু স্পষ্টতর মানুষের বোধ ও মেধার কঠিন পাথরে।

জীবনে অদ্ভুত উষ্ণতা আছে, প্রতিবাদ-প্রতিরোধে নিত্য উচ্চারণে
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে মানুষ—
এ ভাবেই বিবর্ত্তন—সৃষ্টির প্রথম থেকে
মারীচের ছদ্মবেশ চিরকাল আড়াল থাকেনি
প্রত্যয় ও চেতনার মানুষেরা নিজেকে জেনেছে।

গণেশ বসু (১৯৪১)

৭১. তাকে

কারো কারো স্মৃতি কেন সংশয়ের মেঘ হয়ে বুকে ভেসে ওঠে
কারো কারো স্মৃতি কেন সন্দেহের বাঁকা ছুরি বুঝতেও পারি না।
ঝাঁঝরা হয় সব কিছু, শুরুতেই ডানা মেলে সূর্যাস্তের অমোঘ ঈগল,
চুল ছিঁড়ি, সংকুচিত হয়ে উঠি, জটিল রহস্য
মনের ভিতরে মন রেখে কথা বলে চলে, কাঁদি আমি জঙ্গলের ঝোপে
ছিন্নভিন্ন সূর্যমুখী, জলতরঙ্গের সুর মূর্ছা যায় আমার সত্তায়।

কি যে ছিল তার চোখে, কি ছিল নিষাদ?
কি যে ছিল কণ্ঠে তার হে আমার অঙ্গার-আত্মিকা?
বলি আমি, বুকের ঢালুতে মুখ সঙ্গীতের ডানা মেলে বলি :
ওকে তুমি ভুলে যাও, যাও—
যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার গানের
যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী শস্য ভরা তোমার মাঠের
দূরতম দিগন্তের রোমাঞ্চিত মুখর ইচ্ছার।

তুচ্ছতায় ব্যথা জাগে, উপেক্ষায় ভেঙে পড়ে জীবনের শান্তি ও গৌরব,
দীর্ণতার কালকেউটে তেড়ে আসে, অথচ আমিই
সেই আমি, বিশ্বাসহীনতা যার স্বপ্নেও ছিল না কোনোদিন ;
সেই আমি, অন্ধকার হননের কুঠার নিয়েছি কাঁধে দীর্ঘকাল আগে
তারও বুকে করাতের শব্দ হয়, ঘুম নেই, দেখি
ঠোঁট চুঁয়ে ঈর্ষা ঝরে, যন্ত্রণায় দোলে মুখ শান্তির সঙ্গীত।

দ্বৈত ভঙ্গিমায় হাঁটে ছায়া কার, খাঁ খাঁ বুক, আশ্চর্য প্রতিমা।

শংকর দে (১৯৪১)

৭২. হত্যাকারী, মানুষ না মানুষের হাত

শখের আগুনেই একদিন দেখেছিলাম তোমাকে
দেখার পরেও দেখা
অহংকার, শখের আগুনেই জেলে দেখেছিলাম তোমাকে না
আগুন!

কে জানে থেকেই গেছে বৃষ্টিঘরে ছায়ার মতো কি
আগুনেই হাতে ধরে দেখা, দেখার পরেও দেখা, আজ
পরশুর চোখে অশ্রুসার তুমি না আগুন।

কেঁদে ওঠার অন্নেই আজ কষ্টের মানুষ
বেঁচে থাকার হাতেই আজ প্রতিদানের রক্ত মানুষেরই
কপালের চোখে আজ আগুন জ্বলছে।

বাংলাদেশ আমার নিরাময় অসুখেই আজ
হত্যাকারী, মানুষ না মানুষের হাত।

শিশির সামন্ত (১৯৪২)

৭৩. ধ্বংস

প্রভৃত ধ্বংসের এই বায়বীয় ডানা
চারিদিকে উড়ন্ত তৈজস,
ওড়ে সোফা, ফটো ওড়ে, গৃহস্থালী ওড়ে
উডন্ত নিজের মূর্তি, স্মৃতিচিহ্ন সব।

এ বাতাসে ভালোবাসা ওড়ে,
রূপ ওড়ে, ধ্বস্ত ওই গ্রীক নাট্যশালা
ভারী পট ওড়ে,
এখন কোথায় বাজে বোবা বাঁশি
বাঁশি ওড়ে,
উজ্জ্বল শরীর নিয়ে দেবশিশু ওড়ে
একি সব ধ্বংসময় লীলা।

জীবনের অবক্ষয়ে উন্মোচিত হয়ে ওড়ে বিপুল ট্রাজেডি,
নায়িকার মতো নারী উড়ে এসে বলে
'টেবিলে রইলো এই এককাপ চা'
লহমায় যেন যাদু, প্রবাহিত হৃদয় স্বননে
তারও কি সুগন্ধ ওড়ে !
চুল ওড়ে প্লাবিত হাওয়ায়
অপরূপ একি রূপলীলা।

নাগরিক অস্তিত্বের চারপাশে
মিনার গম্বুজ ওড়ে
টুকরো টুকরো ছবি জড়ো করি
সমস্ত জীবনব্যাপী প্রতিমার খেলা

১৪. বিদ্যাসাগর

কবন্ধ বিদ্যাসাগরের স্ট্যাচু, মাথার উপর নীল
সামিয়ানার মতো আকাশ। দূরে বিস্তৃত ওই
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকার। রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে
দিনশেষের রোদ্দুরে দু একজন শিক্ষার্থীর বুকে বই খোলা।

উনবিংশ শতাব্দীর তন্দ্রাছুট, যে পড়ুয়া বর্ণপরিচয়ে পড়ে অ, আ,
মনে তার আঁকা ছিলো বিরাট পৌরুষদীপ্ত একজন, স্মৃতির জিঞ্জিরে
মঞ্জীর বাজায় আজো যেসব লৌকিক রূপকথা স্বপ্ন কি জাগ্রত!
আসছে পণ্ডিত হেঁটে দেখি দূরে, মাথায় রয়েছে তার গোলপাতার ছাতা.

বিদ্যাসাগর হলো সমাগত, কি হে পণ্ডিত? আজকের ছেলেরা
বঙ্গে সংস্কৃতিমন্য, যে দিন জাতির কোন কলংকে তোমার মাথা
কাটা যেতো, হীনমণ্য দুর্বলতা দেখে। আজ যে স্বাধীন,
দেখছো, বিদ্যাসাগরের মূর্তিটা ভেঙ্গেছে সময় জাতক ওরা কারা?
কবন্ধ বিদ্যাসাগরের সাথে মুখোমুখী যখন এই বিদ্যাসাগর,
হেসে উঠলো মৃদু, একজনকে সৌধ করে রাখা। নিজের ভঙ্গীমা দেখে
বলে শেষে এ মূর্ত্তি সরিয়ে ফেলো তা হবে নৈতিক পবিত্রতা।
প্রভু! তোমার কি অভিমান হলো? তোমার যে অসম্মান, প্রাচীনের
মূল্যবোধ শূন্য হয়ে যায়, যা কিছু ভাঙ্গছে এই অশান্ত ছেলেরা! বিস্মরণে,
একমাত্র বিদ্যাসাগরের ওই অনমনীয় প্রবল পৌরুষ
যেকোন রাজার কপালেতে
যে পারে আঘাত দিতে ছুঁড়ে দিয়ে ধুলোয় মলিন ছেঁড়া জুতো।
যারা এই বিদ্যাসাগরের দেশে এখন সদর্থ বংশধর
তাদের যে ইতিহাস পড়া
শুধুমাত্র ভাবোচ্ছ্বাসে মূর্ত্তি ছিলো, মাথা যার ছিলো না, শুধু ধড়, এসময়ে
বিদ্যাসাগরকে হলো জানা, বিবেকের শিহরণে রক্ত দিয়ে রাখলো স্বাক্ষর
এখনো বিশ্বাস হয় মনুষত্ব আছে এ কোলকাতার।

আবারও বিদ্যাসাগর এসে দেখা দিলো বালখিল্য শিশুদের
এ ক্ষমা সুন্দর মুখে অমায়িক হাসির প্রতাপ। গ্লানি মুছে
এ বাতাবরণে দেখি আর এক অসহনীয় পাপ, বিদ্যাসাগরের পায়ে
স্ট্যাচুর ওই পাদদেশে গড়িয়ে পড়লো কেউ অব্যর্থ গুলির তাগে ;
কেউ তাকে করলো না ক্ষমা, সমারূঢ় বিদ্যাসাগরের স্ট্যাচু,
হায় কি প্রমাদ !

অলককুমার চৌধুরী (১৯৪৪)

৭৫. একফালি দীর্ঘ কালো চুল

চন্দন জোৎস্নার মাঝে মহিষের প্রবল হুঙ্কার মিশে থাকে
ঝর্ণার মিহিন শাড়ী ছিঁড়ে যায় বাবলা নখরে
মূর্ছিত কুহক ভেঙে উড়ে আসে বিষণ্ণতা
হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসে সাপের খোলসভাঙা শব্দ
অলৌকিক ক্ষমতা হারিয়ে, জলের গভীরে
ডুবে
যায়
পবিত্র মানুষ
শিশুর প্রথম দাঁতে আমিষের গন্ধ লেগে থাকে

হায়, ক'টি সন্ধিক্ষণ
উদাসী আলোর করতলে
স্নিগ্ধ জামরুল
দরিদ্র সংগ্রহখানি হেলায় ফেলায় ধূলিহীন
বড়ো অপচয়, ক্ষীণ
বাঁশের ডগায় গাঁথা শীর্ণ চাঁদ
মেঘের কৌটোয় ডুবে যায়
কেন—
ছুঁচের ডগায় কিছু কিছু ফুল তোলা
বৃথা নয়

জীবনের সাস্ত্রীর পোষাকে লেগে থাকা
বিগত রাতের
একফালি দীর্ঘ কালো চুল

৭৬. কাঠের ঘোড়া

কাঠের ঘোড়াব হাওয়ায় কেশর ওড়ে
স্বপ্নের ভেতরে ছোটে টগবগ শব্দ
মুখে ফেনা
খুরের আঘাতে ফোটে আগুনের খই
মুহূর্তে পেরিয়ে যায় কাঁটার প্রান্তর
দূরের সবুজ মাঠে
প্রতিধ্বনিমুখর বাতাসে
দোলে তার হ্রেষা।
ছুটে চলে শতাব্দীর ঘোড়া—
সে কাঠের ঘোড়া
রোদে পোড়া বোধিদ্রুম গঠিত শরীর নিয়ে
দাঁড়িয়ে রয়েছে
মধ্যপ্রাঙ্গনের অনড় অস্তিত্ব।

কালীকৃষ্ণ গুহ (১৯৪৪)

৭৭. আদিম জননী

তুমি আদিম জননী।
তোমার সাম্রাজ্য ঘিরে নির্জনতা, সারি সারি গাছের বিস্তার
প্রতিটি দিনের বাঁচা, ছায়া, সূর্যালোক ...

কোথা থেকে আসে ট্রাক—
স্তিমিত গর্জন ক'রে রাত্রির আকাশে মিশে যায়।
তাদের ড্রাইভার উন্মাদনা থেকে তোমাকে সন্তান দিয়ে

বারবার উধাও হয়েছে।
সেইসব সন্তানেরা একে একে ফিরে গেছে লোকালয়ে—
চায়ের বাগানে, বাঁধে, খনির ভিতরে, অন্ধকারে, গাঢ়তর জীবনের টানে।
'হেইই বাহাদুরদা' ব'লে তারা শৈশব অতিক্রম ক'রে চলে গেছে।

তুমি লোকালয়ে গিয়ে, ভিড়ে, ভূতগ্রস্তের মতো, খুঁজেছো তাদের মুখ—
তারপর, আদিম জননী, ফিরে গেছো অরণ্যে আবার।

আজ কেউ পাশে নেই। নক্ষত্রের গল্প শেষ হয়ে আসে। আজ
তোমার জরায়ু ক্লান্ত।
তবু শোনো, রাত্রি জুড়ে, আরণ্যক ট্রাকের গর্জন।

৭৮. **এই দেশ**

হারানের কথা যদি বলো তবে কি উত্তর হবে, জানি।
হারান পায় নি ভাত অথবা বিচার।
ফলে, সে, পুরাণ-কল্পে, ভূত হয়ে আছে।

এই দেশ—এই সব বটগাছ বাবলা-শিমূলগাছ—হারানের,
হারানের ভাই বন্ধুদের।

এখনো জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখি :
আকাশে—অনেক দূরে—লণ্ঠন জ্বলছে ; তার পাশে ব'সে আছে
মাথা-নিচু প্রেতাত্মা হারান।

পার্থ রাহা (১৯৪৫)

৭৯. **আমার জন্য**

তবুও কখনো কখনো তোমার স্বর
আমায় পিছু টানে

আকাশ সমুদ্র মাটি
আমার ঘুমন্ত বুকে জেগে ওঠে

দু'জনের বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মধ্যে
বিগত সূর্যের দীর্ঘতর ছায়া
তমসার তিমিরের নির্জনতা

পিঠেতে চুলের গুথলানো ঢেউয়ের দাপটে
বৃষ্টিতে পাখির ডাক
দুপাশের ভিজে ডানায়
এক অফুরন্ত ছায়া
ছায়ার ভিতর
দুটি নতুন পাতার ফাঁকে জমানো নৈঃশব্দ্য

তোমার হৃদয়

হয়তো আমার জন্য কোন ঘর
স্থির করা নেই
হয়তো আমার জন্য তোমার চোখের শিরার
জ্যামিতিক রেখায়
কোন স্বর্গ নেই

হয়তো আমার জন্য

শিবাজী গুপ্ত (১৯৪৫)

৮০. গুহাশিল্প

চৈত্রদুপুর জুড়ে গ্রন্থছায়ায় তার চোখে নেমে এল
ঘুম আর ঘুমের ভেতর বর্ণময়তার বিরুদ্ধে
কারা যেন ঘোর যুদ্ধ শুরু করে দিল শতাব্দীব
গুহার অন্ধকারে রক্তজবার ওপর ঝরছিল
অঝোর শ্রাবণধারা। ঝরাপাতারা উড়তে
থাকলেই গল্পের সন্ন্যাসীর গেরুয়া কণ্ঠস্বর
ছড়িয়ে যেতে থাকে হাওয়ায় শোণিতে হাওয়ায়
শোণিতে হাওয়ায় মনস্তাপে। কবিতার পাথর
ভাঙতে থাকি একমনে। তুমি কি জেনেছ শুধু

ভাত আর চিতার সংহতি। স্বচ্ছন্দ বুভুক্ষা
খেয়ে যায় কল্পনার মায়াশিল্প তার হাড়কাঁটা
অর্ধেক সত্যের আবর্জনার ভেতর মুখ থুবড়ে
পড়ে থাকে শুধু পড়েই থাকে। জলে ভেজা
রক্ত জবার দুটো একটা তারই দিকে
ভেসে আসতে থাকে

অজয় নাগ (১৯৪৬)

৮১. ঋণ

একটা সাদা পাতা বুকের উত্তাপ আড়াল দিয়ে আনি
যাতে তাতে একটুও ঘামের নুন না লাগে
বাইরের আঁচ ও আওয়াজ না আসে মন্ত্রপূত গণ্ডী কেটে দিই
দরোজা-জানলা বন্ধ করে শব্দগুলো আগে-ভাগে
গুছিয়ে সাজিয়ে নিই

একটা দুটো তিনটে কম-সে-কম শান্ত সুগম
চারটে আকাশ নিয়ে কিছু সাদা-কালো ধূলিপথ ব্যথা
বৃক্ষ-ছায়াতল ধৌত স্নেহজাজিম—স্তনের প্রসন্নতা
এবং কিছু কিছু বিখ্যাত ছবির পাকা রঙের গম্ভীর নিনাদও
খুঁটে খুঁটে নিশ্চুপ সংগ্রহ করি

একটা কবিতা—শুধু একটা মাংসল কবিতা আসুক
আমাকে ঘিরে ঘনিয়ে উঠুক—বৃষ্টি হয়ে ঝরুক—লাল বৃষ্টি
কিছু নেই দরকারি কাজ কিছু থাকবে না—চেতনায়
নদীর অগাধ মহিমা যদি দেয় প্রেরণা যতদূর দৃষ্টি
নিজেকে মেনে নেবো একা স্বতন্ত্র এই স্থূল দুনিয়ায়
ফিরে তাকাবো না জলন্ত শালুক নক্ষত্রের দিকে
ধূম কেশরের দিকে
করোটি পাহাড়ের পোয্য ঝোরার জলে ভেসে যাওয়া নাভিকুণ্ডের

স্থনীড় স্পন্দনের দিকে
তাড়কারাক্ষসীর ঘুম-ভাঙা ক্রোধ কিংবা গলিত পিঙ্গল চিকুর
ঢেকে দিতে পারবে না
বন্ধ্যা মায়াবী সন্ধ্যার বাতাস ভাসাতে পারবে না দূর
আমাকে এই আমাকে—ব্যর্থ জীবনের শক্ত পাথর যে

ভুলে থাকবো রিক্তের বেদনা—চিতার অভিমান
উনিশ অপমানের লাথি—ঝাঁটা গলাধাক্কা
ফুলটুসি ঠিকে ঝিয়ের মুখ-ঝামটা বেশ্যার গঞ্জনা
সতের দিন না খেতে পাওয়ার যন্ত্রণা—মারণ তাড়না
ভুলে থাকবো গাঁজার ধোঁয়ায় রচিত স্বর্গধাম
প্রলম্ব সংগীতের চাঁদ—রামকেলি বিলম্বিত আলাপ
সব সব ভুলে যাবো বেমালুম—রাবণ ও রাম
কিন্তু কি করে ভুলে যাবো হাস্যময়া উপবাসী মায়ের মুখ
আমি কি কুকুর কভু কি ভুলতে পারবো জন্ম-জলের ঋণ

অলোককুমার ঘোষ (১৯৪৬)

৮২. স্বপ্ন

একদিন পিতৃপুরুষেরা স্বপ্ন দেখতেন—

মাটির দেওয়াল ফুঁড়ে উঠছে ইঁটের গাঁথুনি,
মাথায় ছাদ, উঠোনে শুকোচ্ছে সোনালী ধান,
পাশে ধানের মরাই, একধারে খড়ের ডাঁই,
দুধেল গাই হাম্বা তুলছে গোয়ালে,
ভাতের থালায় পুকুরের মাছ, পঞ্চব্যঞ্জন
—এসব স্বপ্ন নিয়েই তারা চলে গেছেন নিঃশব্দে, গোপনে
শীতে পাতাঝরা গাছের মতন।

অবশিষ্ট যা কিছু ছিল স্রোতের টানে জমা হয়েছে একদিকে ;
নিজের জমিতেই এখন পরবাসী উত্তরাধিকারী যারা আছে বেঁচে
বন্যা, খরা, অজন্মায় দিনান্তে থালায় মহার্ঘ একমুষ্টি ভাত,
রুগ্ন, ক্লিষ্ট, ক্ষীণ হাতে ক্রমশ উঠে আসে ভিক্ষাপাত্র ;
শহর টেনে নিয়ে যায় নাড়ির টানের মতন, ফুটপাত
ভ'রে তোলে এইসব আগাছা-মানুষ।

শুভ বসু (১৯৪৬)

৮৩. পাণ্ডুরযাত্রায়, সহোদর

এই-যে কালনাগিনী আজ গরল দিল জীবনে, আমি কাকে
দোষ দিয়ে দায় ভুলব, আমার বাসরঘরের সহজ অহংকার
জানত আমি শরীর জুড়ে বহন করি বীজের তৃষ্ণাজল,
বহন করি মমতা, যার একটি দুটি ক্ষীরের মত ফোঁটায়
প্রাণ পেতে পারে অঙ্কুর। কত সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা
মায়া সিঞ্চন করেছে এবং অধীর করেছে আমাকে।

এই যে বিষে বিনষ্ট আজ প্রাণ, যা আমার চূড়ান্ত পূর্ণতা
তা-কি মানুষের শিবসাধনারই অন্তিম পরিণাম ?

তবে দোষ দেব কাকে দোষ দেব তবে কোন সান্ত্বনা
আমাকে আগলে রাখবে পাতালশাসনের সংসারে ?

ও সোদর, পিছু ডেকো না, এখন বিষজর্জর দশদিক, তাই
দায় নিতে হবে নিশিদিনমান নিদ্রাবিহীন একাগ্রতায়,
দাঁড় বেয়ে বেয়ে যেতে হবে স্থির অধীর আমাকে।

ভেসে যেতে হবে অনিশ্চিতের আর অজানার ভেতর, এবং
ঝুঁকি নিতে হবে প্রতিকূলতার, পথ হারাবার, লোভ ও ভয়ের
হাজার হাজার মুখোশের লাল রক্ত চোখের প্রচণ্ডতার।

সম্বল শুধু নন্দন, আর কিছু নেই, শুধু সুন্দর, যাকে
ছন্দ-শরীরে রূপ দিতে চাই, প্রাণ দিতে চাই, মুক্তির
প্রখর মহিমা যাতে দশদিকে ঝঙ্কার তোলে, আর কিছু নেই।

যাবো তবু তাই, ও সোদর, পিছু ডেকো না, এখন
চারিদিকে জল থলথল করে হাসে।

অমিতাভ গুপ্ত (১৯৪৭)

৮৪. তারপর

সারারাত বুনো বোবা চাঁদ
আমাদের খড়ের চালার
পিছনে উলঙ্গ শুয়ে ছিল
ঘরে ঘরে ঘুমহীন রাত

রাক্ষসের হাসি তারপর
উঠে এল পূবদিক জুড়ে
শুরু হ'ল আমাদের দিন
শুরু হ'ল আমাদের ক্ষয়

কতবার ভেবেছি রাতের
উলঙ্গ চাঁদের স্মৃতি মুছে
বিষ মুছে সূর্যের আলোয়
চলে যাব দিগন্তের দিকে

অন্ধকারে আমরা থাকব না
এই বন সরিয়ে একদিন
সব কৃষিজমি গড়ে নেব
অথচ সূর্যেরই ক্ষয় হয়

সূর্য নেই? সূর্য নেই ঘরে?
অন্ন নেই? প্রাণ নেই? আলো?
রাহুর মতন কালো মেঘে
তবু যেন বিদ্যুৎ চমৎকাল

মনোজ নন্দী (১৯৪৭)

৮৫. দায়ভাগ

আগুন নেভেনা কখনো নেভেনা
হাত-বদল হয়ে যায় শুধু
বারবার ফিরে আসে হাত ঘুরে ঘুরে
আমাদের ব্যক্তিগত শব্দমালা আগ্রাসী ক্ষুধায়
ফিরে পেতে চায় স্মৃতিমর্মরিত সদরের চাবি
শেষ রাতে সহজাত আধখানা সমাধি-ফলক
বাবার হাতের থেকে ঝরে যায় গুপ্তবীজ অস্ত্রের আগুন
তাঁর সন্ততির হাতে আগুন নেভেনা
হাত-বদল হয়ে যায় শুধু
আর শেষরাতে পুড়ে যায়—পুড়ে যেতে থাকে
আমাদের ব্যক্তিগত শব্দমালা সুখ ও সমাধি
অর্থহীন কাম কবিতা ও ফুসফুস
আগুন নেভেনা কখনো নেভেনা
হাত-বদল হয়ে যায় শুধু নিহিত বীজের ছায়ায়

অজিত বাইরী (১৯৪৮)

৮৬. শোল মাছ

ভাঁড়ার ঘরে ডেক্‌চিতে সারারাত সাঁতার কাটছিলো শোলমাছ।
দু'চোখে নেমেছিলো মদির স্বপ্ন :
মাইল মাইল সাঁতরে পৌঁছবে দূর উপকূলে,
সাগর মোহনার সংগমে উষ্ণ স্রোতে মেলবে তরুণ পাখনা,
অঙ্গে মাখবে অস্ত-সূর্যের কাঁচা সোনা।
এদিকে সারারাত গিন্নীমার পলক পড়েনা ;
যদি ডেক্‌চি উলটে পালায় শোল,
যদি পড়শীর উপোষী বেড়াল নিয়ে যায় লুঠ করে।
মনে-মনে সারারাত শানায় আঁশবটি।
জানলার জাফরিতে ফুটে ওঠে ফিনফিনে ভোর, হালকা তাজা ভোর।

খুশীতে চল্‌কে ওঠে গিন্নীমার চোখ।
ডেক্‌চির ভেতরে ডোবায় হাত, হাতের নাগাল থেকে পিছলে যায় শোল।
সাঁড়াশির মতো ক্রমেই শক্ত হয় হাত।
ডেক্‌চির ভেতরে সতর্ক হয় শোল।
কে কাকে হারায়—তীব্র প্রতিযোগীতায়
থলবল থলবল শব্দ শুধু ডেক্‌চির ভেতরে।
হঠাৎ-ই গিন্নীমা আনমনা হয়ে কী যেন ভাবে।
চকিতে পলক ফিরিয়ে দেখে
আঁটো-শরীরে সেঁটে আছে দরজার পাশে ছোটো বৌমা।
দু'হাতে ডেক্‌চি উপুড় ক'রে ঝাঁকায় আর শাসায় :
একরত্তি শরীরে এতো তেজ!
শাশুড়ীর চোখে চোখ পড়তেই
হিম নিস্তেজ শোলমাছের মতো ফ্যাকাশে হয়ে যায় ছোটো বৌমা।

রাণা চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৮)

৮৭. **ছায়াগাছ**

নিয়ত ঝড় আসে, নিয়ত তট ভাঙে নিয়ত ভালবাসা
ওড়না খুলে দেয়
নিয়ত চোখ মেলে, দেখেছি ছায়াগাছ, রঙিন রোদ্দুরে
একলা পড়ে থাকে।
আমি কি যাবো ফিরে, অসীম নীলে ওই, আকাশ গঙ্গায়
কি সুখে মেঘ ভাসে!
আমি কি উন্মাদ, প্রলয় তুফানেতে, হয়েছি চুরমার
নিশীথে ভাষা খুঁজে?
আমি কি ঈশ্বর, দ্যুলোক-ভূলোকে, প্রভাতী বিভাবরী
আমারি বোঝা পড়া!
সতত ভাঙাচোরা, আলো ও আঁধারের, বিপুল রূপবান
কে গায় সংগীত!
কে নেয় লুটকরে, কোন সে তাপসীনি, গভীরে আনাগোনা

কে ডাকে, চলে আয়।
কে বলে ভয় নেই, পতাকা লাল রঙ, গোলাপে কাঁটা আছে
তবু সে সুন্দর
তবুও ঝড় আসে, তবুও ছায়াগাছ, তবুও রোদ্দুরে
একলা পড়ে আছে
তবুও প্রতিবাদ, তবুও ধূলোওড়ে, সোনার মেঘে মেঘে
ব্যাকুল ছায়াগাছ।

৮৮. স্বর্ণপিঙ্গল অমরত্ব

তুমিতো সবই জেনেছো, জেনেছো সম্ভোগজনিত সুখ,
পুরবাসীরা যখন নগরে তোমাকে নিয়ে আলোচনা করে
তুমি গিরিশৃঙ্গের আঘাতে
মস্তক চূর্ণ করে দিতে চাও শত্রুদের, ওই ভয়ঙ্কর শত্রুদের।
অথচ মায়াবলে তুমি বুঝতে পারো আনন্দধ্বনির কথা
বিপুল ভালবাসার কথা
অশুভ ঊর্মিময় স্রোতের কথা
খুব কষ্ট পাও কবন্ধের মতো এই মৃত্তিকায় অন্তরীক্ষে
মহাচীনের রত্নশোভিত ঘোড়ার ক্ষুর থেকে রক্ত ঝরছে
স্বর্গদ্বার থেকে রক্তের স্রোত কিছু কি বদলে দিতে পারবে ?

তুমি তো সবই জেনেছো, অসিবর্ণ এই আকাশ
নরমুণ্ডলাঞ্ছিত বলগর্বিত এই সভ্যতা, স্বপ্নময় সমানাধিকার
বাদামী মেঘের আস্তরণ খসিয়ে
সবুজ প্রান্তরে হারিয়ে যেতে চাইছে
হায়, কিসের মিত্রতা, কিসের শত্রুতা, কুবলাখানের তরবারি
তৈমুর লঙ-এর মহা হু-হুঙ্কারে কালদণ্ড নিক্ষেপ করছে মৃত্যু।
আজ বা আগামীকাল বলে কিছু নেই অখণ্ড সময়
আর মানুষের স্বাধীনতা মহেঞ্জদারো-হরপ্পার শিলমোহর থেকে
অজন্তা ইলোরার গুহা চিত্র থেকে তুলে আনছে মহা আনন্দ
স্বর্ণপিঙ্গল নেত্র অমরত্ব মানুষের এগিয়ে চলার ইতিহাস।

বিপ্লব মাজী (১৯৪৯)

৮৯. সঞ্চার

যৌবনের তীব্র কোলাহল নিয়ে
সেই সকাল থেকে বেরিয়েছি
হিস্পানি লাল টাট্টুর মতো
রক্ত নাচছে শিরায় শিরায়

দুচোখে জ্বলছে কামনার শিখা
ধাবিত তোমার দিকে বর্শা
জলের গভীরে ঘুরছে শেকড়
দাউ দাউ প্রেম শাখায় শাখায়

অথচ তুমি রহস্যময়ী
স্পেনের জিপসি মেয়েদের মতো
গভীর তোমার সূর্য হৃদয়
বাঁচবার আর মরবার মতো

এত কঠিন এত সহজ
তোমাকে জানানো ভালোবাসা
টুঁটি চাপা দিন ও রাত্রি
বদলাচ্ছে ও চোখের পাতায়

ভয়ঙ্কর লাগছে নিজেকে
যেন আমি এক খাপ খোলা ছুরি
পিয়ানো বাজছে স্মৃতিতে আর
নিস্তব্ধতা সারা পথ জুড়ে

পরিশ্রান্ত করবো তোমাকে আর
পরিশ্রান্ত, ভ্রমণ সারব পথে
বিস্ময়ে তুমি তাকাবে অশ্রুমতী
গর্ভে তোমার শিশুটির মিঠে রঙ ধরবে।

পলাশ ভট্টাচার্য (১৯৫২)

৯০. যে শিশু

যে শিশু কোজাগরী রাতে ভিক্ষা চায়
তার কাছে নীলাকাশ কিংবা পালঙ্কের গল্প ম্রিয়মান.
তার চেয়ে মনোহারী দোকানে কত শস্তায়
পাওয়া যায় রুটি, তার সন্ধান দিলে
এখনও ত্'পাঁচটা সিঁড়ি এক লাফে পার হতে পারে।

বর্ষায় যখন পর্দা টানে ঘর
জলামাঠে সাঁতরে সে স্বর্গ সুখ বোঝে।
এরকম দৃশ্য দেখি, ফিরি ঘরে
আর পৃথিবীর নীতিবাক্য ভেসে যায়
শিশুটির সাঁতার মাখানো জগা জলে।

যে শিশু কোজাগরী রাতে ভিক্ষা চায়
সে জানে, প্রতিমার ভাসানো কাঠ তার দৈনিক আয়।
বর্ষপূর্ত্তি কিংবা রঙিন ভাষণ, তার কাছে,
একই ছাঁচে ঢালা মূর্ত্তি মনে হয়।

শম্ভু বসু (১৯৫২)

৯১. পাহাড়ী ষাঁড়

পরপর সাজানো লালনীল পানপাত্রের লোভনীয় সুরায়
হার-না-মানার দাম্ভিকতা এবং না-খাওয়া দিনের দীর্ঘ জ্বালা উপেক্ষায়
দামাল চিতার উপর বাঁকানো বর্শা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ী ষাঁড়
যুদ্ধজয়ী গর্বিত সৈনিকের মতো বিশাল আকাশ মাথায় ক'রে।

জ্যৈষ্ঠের নিষ্করুণ সূর্য ঝলসানো বিদ্রোহী বায়ু উপেক্ষায়
বিশাল চুম্বকের মেরুদ্বয়ের ভিতর নিরন্তর ব্যস্ত ছুটে বেড়াতে
অমাবস্যার তারা বুকে ঝোলা কাঁধে পাহাড়ী ষাঁড়—
যেন বিশাল ড্রাগনের বুকে দলপাগল যৌবন চূড়ামণি।

রক্তের ভিতর নিরন্তর বয়ে যায় দাম্ভিকতার প্রবল তুফান।

ক্রমশঃ ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া ভোরের সোনালি সূর্যের আলো,
পার্কস্ট্রীটের চোখ ধাঁধানো নিয়ন হয়ে যাওয়া শ্রাবণী জোনাকিতে
যদিও কখনো-সখনো উত্তেজিত হয়ে ওঠে ইচ্ছাদানব চুমুক দিতে সাজানো সুরায়
তবু পারে না ; টুঁটি চেপে ধরে হার-না-মানার প্রচণ্ড দাম্ভিকতা।

সাধন পাল (১৯৫৩)

৯২. **মানুষ ছোঁবেনা**

মানুষ ছোঁবেনা এই শিল্পের উদ্ধার।
মননহীনতা সে তো আজকের আকাশের রঙ।
প্রতিদিন ধর্মে ও ঘৃণায় শেষ চাঁদটুকু ক্ষয়ে যায়,
সাম্প্রতিক এই ছবি পল গঁগ্যা দেখেছিল কত আগে

নিজস্ব সৃষ্টির বাঁকে বাঁকে বাঁচার অভ্যাসে।
উদাস চোখের খাদে মানসিক খরা।
দুর্ভিক্ষের গাঢ় বিভীষিকা পিকাসো ছবির বুক চিরে,
উঠে এসে আমাদের মগজ চিবিয়ে খায়।
বিকৃত মানসে আমার দেশের মাটি জ্বলে যায়,
খরায় নিঃশেষ হোল জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার।
হৃদয়ের করিডরে অনুভূতিহীন মানুষেরা
ঘোরাফেরা করে, শুধু ঘোরাফেরা করে ;
দগ্ধ ঘাস, সবুজহীনতা ঝলসানো মুখ,
আবিষ্কারে ভিন্ন কোন মননের উপত্যকা নেই ;
যেখানে মানুষ সৃষ্টির গভীরতা নিয়ে সমুজ্জ্বল।

জয় গোস্বামী (১৯৫৪)

৯৩. **বীজ**

ফিরো না তামস ফল, সারাদেহে রাত্রি নিয়ে ফিরো না—আমার মোহঋতু
তোমাকে আগুন জ্বেলে উপহার দিয়েছি একদিন। তার পরিবর্তে তুমি
আমার শরীর থেকে শ্বেতকুষ্ঠ মুছে নিলে। জলের উপরে
ধূপ ভেসে যেতো, তুমি পাশাপাশি দেহশীর্ষে পদ্মকে ফুটিয়ে

দীঘিতে ভাসিয়ে রাখলে, আমাকে মৃণাল করে রেখে দিয়ে গেলে
জলের উপরে, নিচে। দূর থেকে কাছে আসা হাঁসেদের জোড়া-পা সাঁতারে
আমার শরীরে এসে লাগে ঢেউ, ভেঙ্গে যায় আবর্ত জলের
তারা দীর্ঘ ঠোঁট দিয়ে পদ্ম থেকে তুলে খায় মিষ্টি জহরত।
শোনো, তুমি শোনো, আমি থাকবো না এভাবে।
তোমার স্খলিত বীজ তুলে নিয়ে যত্ন করে রেখেছি পদ্মের
ভিতরে জানে না কেউ। শোনো তুমি, নিজের শরীরে নিজভ্রূণ
তৈরি করে নেবো আমি। যখন শিশুটি আসবে,
তাকে আমি দীঘিকার জলে
একা ছেড়ে দেবো না, বিশ্বাস করো! তলায় পদ্মের পাতা দিয়ে
ঠেলে দেবো সোজাসুজি নদীর স্রোতের মুখে—ভেসে ভেসে গিয়ে
যাতে সেও ঠেকে যায় তোমার ঘাটের কাছে। তুমি স্নান ভুলে
চমকে উঠে শিশুটিকে তুলে নেবে বুকের কাপড়ে,
তার কান্নাকে থামাতে গিয়ে যেই
মুখে ধরে দেবে স্তন, ঠিক জেনো এই এতদূর থেকে আমি
তোমার সমস্ত দুধ টেনে নেবো—টেনে নেবো আমার মৃণালে।

রতন দাস (১৯৫৪)

৯৪. গড়চুমুক

দিগন্তরেখা চলে গেছে সাদা স্লুইস গেটের উপর দিয়ে
বুনো বাবলার ছায়া পড়ে আছে দামোদরের জীবন্ত জলে
তার ওপর ভরদুপুরবেলায় দুষ্ট-দাম্পত্য করে খেলা
কুমারীর ফিতের মতো নরম রোদ এসে লাগে
প্রবীণ মানুষের চোপসানো ও গর্তময় গালে
তাতে সময় কিছুটা ফেরে, যৌবন উঁকি দিয়ে যায় ঝিলিক মেরে
স্মৃতি ভারি করে চলে যায় মানুষ নিজের আস্তানায়

নদীর পাড়ে বাজুবন্ধের মতো বনেদী বাংলো
তার পাশে ঝাউয়ের নিচে শিশুদের মতো গড়াগড়ি খায়
ম্যাকডোয়েলস্ এবং এ্যারিস্টোক্রাট

বাতাসের হাত ধরে ছুটে যায় চিকেনের তীব্র গন্ধ
উত্তর থেকে দক্ষিণে
নধর-বুক, বব চুল রমণী ধীর পায়ে দিয়ে চলে
পাতে পাতে ভদ্র-ভাতের ওপর থাবলা মাংস

গড়চুমুক আড়াল থেকে গালে হাত দিয়ে দেখে আর ভাবে
এ অঞ্চলের দরিদ্র মানুষ হতদরিদ্র হয়ে যায়..
তাতেই বা হলোটা কি ?
এলিয়ে পড়া মানুষকে নাড়িয়ে দিয়ে বাস
ছুটে চলে শহরের দিকে
হাসি উপচে পড়ে তার ভেতর থেকে
দিন-ভাঙা সূর্য হেলে যেতে যেতে বলে—কিছু পেলে ?

শ্যামলকান্তি ভট্টাচার্য (১৯৫৪)

৯৫. **ফুল দাও**

এ মেলায় খিদে নেই

বাবার পায়ের থেকে জ্যোতি
মায়ের চুলের থেকে আয়ু
আনন্দ বাঁশি আর মাটির সংসার
কি খায়   কেন খায়
জল থেকে ছায়াটুকু নাগরদোলায় নিয়ে যায়

এ মেলায় খিদে নেই
পাশাপাশি ব্রণ আর সুখ
হাতের ওপরে হাত
সাপুড়েরা সাক্ষী থাকুক
মাঝখান দিয়ে উড়ে যায়
ছেঁড়া কাপড়ের সুতো   বাসি শালপাতা
দুরন্ত বালক আর
মেলায় হারিয়ে যাওয়া সে শিশুর মা

অলংকার ভেঙ্গে যায়
দাম শ্যাওলা আবরণ
বিষণ্ণ পুঁতির মালা   রাত্রি অহংকার

এ মেলায় গন্ধ নেই
ফুল সাদা চুরি করে বালিকা সকাল
তবু সব হাত পেতে
ফুল দাও   ফুল দাও   ফুল
বর্ণের অধিক চুরি এই খিদে
একান্নবর্তী পাতা উড়ে উড়ে পড়ে
ফুল দাও   ফুল দাও   ফুল

দুজনের মাঝখানে কল কল বিভ্রম বৃষ্টিতে
পার হয়ে চলে যায় অন্ধ নারী
তাদের দেহের ছায়া   আঁধির অক্ষর
কিশোর কিশোরী ফেরে মানচিত্র হেঁটে
সাইকেলে চলে যায় রাতের আরোহী
আত্মার আহার খেতে
ঐতিহ্যের শব যায়
বাহকের ক্লান্ত কাঁধে চেপে

এ মেলায় খিদে নেই
ফুল দাও   ফুল দাও   ফুল

সুভদ্রা ভট্টাচার্য (১৯৫৪)

৯৬. নগ্নতা

বুকের কাপড় খুলে গেলে
যুবতী চমকে ওঠে
হাওয়াকে দেয় অভিশাপ
চারপাশ দেখে নেয়
মাটি, হাওয়া ও জল

কে তাকে স্পর্শ করেছে আগে
নগ্নতায় মৌন আবেগে
সে দেখেনি
স্বপ্নের জলযান
মাটির কাছাকাছি সবুজ ফসলক্ষেত
ধূ ধূ প্রান্তরে
শুধু হাওয়া আসে
হাওয়া
সে দেখেছে
নগ্নতা কাকে বলে
ভোরের আকাশছুঁয়ে যে মাটি ছুঁয়েছে
কৃষক রমণীর উষ্ণ আলিঙ্গন
সেই ভোরের পৃথিবী
সেই নগ্নতা
সেই তো আদি

অনন্য রায় (১৯৫৫)

৯৭. **বিদুর**

শূদ্রানী-মা সোহম্‌-দাসী, এমন কালো অক্ষরের চুল্লি জন্ম দিলে,
হে অস্তিত্ব, পোড়াও অহং-কাষ্ঠ।
সত্য বড়ো বীভৎস, তার ঝিলিক দেখে ফ্যাসিস্ত-চক্ষু বুঁজে
জন্ম নেবে কেবল অন্ধরাষ্ট্র।

ধর্মশাস্ত্র, ফ্যাকাশে, তার আমিষ যুক্তরাষ্ট্র-আগ্রাসনে
জন্ম নেবে কেবল মৃত্যুরতি ;
বিকল্প এক ম্লেচ্ছ ভাষার গ্র্যনড্রিসে-সুড়ঙ্গ খুঁড়ে : সশস্ত্র উত্থানে
এড়ানো যাবে জতুগৃহের ক্ষতি।

ফ্রী-মার্কেটের অক্ষক্রীড়া, পণ্যপূজার মেশিন-মাৎসর্য
ধন্য হলো দ্রোপদীর বস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রিটিশ পুঁজির-বলাৎকারে।

ভারতবর্ষ : ক্লীবের স্বর্গ ! দ্যূতসভার নগ্ন উরু, রজস্বলা কৃষির কক্ষপথে
সোনার চাঁদ পৃথুল হলো শ্রান্ত শ্রোণীভারে।

এবার তবে সর্বস্বান্ত। সর্বহারা, বাজাও পাঞ্চজন্য !
কুরুক্ষেত্রে নেতির নেতি : গর্ভিনী হও আবার ! শূদ্রানী-মা,
হারালো সব পুরনো স্মৃতি, সর্বগ্রাসী অভ্যাসের পাপ
শ্মশান ! শুধু শ্মশান জ্বলে ! অক্ষরের খিধবা হিরোশিমা !

এবার তবে ভবিষ্যময় ক্রেমলিন-বাণপ্রস্থে যাব ? আবার ধৃতরাষ্ট্র ?
—সাংবিধানিক মোক্ষ শুধু মরা গাছের ডাল ;
যুধিষ্ঠিরের শরীর ! নাও নস্যাৎ, নাও কাষ্ঠখণ্ড,
চুল্লি হয়ে জ্বলবো চিরকাল।

ব্রত চক্রবর্তী (১৯৫৫)

৯৮. সঙ্ঘের ভেতরে

সঙ্ঘের ভেতরে এসেছি। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর থেকে শীতাতপ
নিরাপত্তায় ! কিন্তু সুখের এত ক্ষমতা নেই আমাকে নষ্ট করে।
একটু নড়াচড়ার ঝুঁকি নিতেই বাইরের পৃথিবী ঘরে। কেউ
বসবার চেয়ারে বিষপিঁপড়ে রাখে। গল্পের ছলে কেউ ঠেসে
ধরে বাবলাকাঁটার স্তূপে। নাম আর পদবীর মাঝখানের ফাঁকায়
কেউ জ্বলন্ত সিগারেট ঘষে। আর আমার ভেবে শিহর লাগে
যে আজও পরীক্ষায় আছি। কাউকে বলিনি যে রোদ্দুরে শরীরের
তামা বৃষ্টিতে বুকের জমানো হীরে আগুনে নিজের অক্ষর গালিয়ে
তবে এখানে এসেছি। ফলে সব্বাই ফাঁকা নাবাল জমি ভাবে। তাঁবু
খাটায়। সুখদুঃখের নাটক করে। তাঁবুর খুঁটি যখন বুক
এফোঁড়-ওফোঁড় করে, আমার ভেবে শিহর লাগে যে, আজও
যন্ত্রণা আমাকে ছেড়ে যায়নি। চুঁইয়ে-পড়া রক্তের ফোঁটাগুলো
যতক্ষণে ফুল ততক্ষণ, কালোর ভেতরের সাদা খুঁজি। সবুজের
আড়ালের কমলার সঙ্গে দেখা করি ? লালের চামড়ার নীচে যেখানে
হলুদ মিশে লালাভ হলুদ, তার লালে ও হলুদে নিজেকে টুকরো
করি। ছাড়াই। ওড়াই। আঃ।

মৃদুল দাশগুপ্ত (১৯৫৫)

৯৯. ডাকনাম

আগে বলি. দাঁড়ালাম মাটি ছুঁয়ে ; কিন্তু কতো বাতাসের প্রলেপ প্রহার সব
স্বীকার করেছি, তবু আজ যতো দোলা দিয়েছো তুমিই
তাই আমি অন্ধ, সাহসিনী তোমারই তো শিকার হয়েছি

বাণিজ্য কঠিন ; তাছাড়া চরিত্রে নেই পাল তুলে দড়িদড়া খুলে ও গুটিয়ে ঠিক
তিথি ও নক্ষত্র দেখে বন্দরে পৌঁছোনো, তবে আমার জানালা আছে
একটু পাহাড় ঝর্ণা, তাই থামি. মাঝে মাঝে তোমাকে দেখাবো

স্মারক পাঠাই, নাও ; আগে বলি, যাবোও তো, তাই ডাকি ঘিরে ধরো
গ্রাম থেকে তুমি দুধ নিয়ে এলে বৃষ্টি বাঁচিয়ে যদি,
আমার কাঁধের ভারে দেখো জল রুখে দেবো
যাতে ধানে ভরে যায় সামনের মাঠ।

ইঁটের লোহার নই—তাই থাকি।…একটু যায়গা শ্বাস—জানি লাগে
আমিও দাঁড়াই ভেঙে, তুমি ছাড়া কে জানাবে ওদের একথা ?
তাই আমি যে তুমুল সংঘ—যে ভাঙে আমাকে, তুমি
তাকে দেখো সন্তানের মতো

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায় (১৯৫৬)

১০০. ফেরা

রাত্রি, ওগো গুহা, যষ্টিহীন অন্ধ এই, দুহাতে সূর্য দাও, পরাও সকাল
ওগো ঘুম, মারো লাথি—মারো, মুখ থুবড়ে পড়ুক পাথরে।
পাথর কামড়ে থাক, ওকে বীজ দাও, বীজের শক্তি ঢালো, কোষ থেকে
কোষে।
আদিম অন্ধকার জড়িয়েছে গায়ে ? ঝেড়ে ফ্যালো অথবা নিড়ানি
তোলো হাতে।

ঘরে কি ফিরেছে ও, জানালা-দরজা খুলে দিয়ে চিনেছে কি বাড়ি ?
তাহলে ডুবতে দাও, ভাসতে দিওনা ওকে
ডুবুক ও ডুবে যাক গানে ও আঘ্রাণে
প্রাণে. সমুদ্র ধরুক, সুনীলে ভাসুক—দুটো চোখ থাক ওর অদেখা ভুবন ॥

মলয় পাত্র

১০১. **তারপর**

তারপর একটা তারা দেখিয়ে তাকে বলি :
ওই দেখো, স্বাতী নক্ষত্র ।
আসলে
সেটা স্বাতী হতে পারে, নাও পারে ;
আমি চিনিনা, তবু বলি । কারণ
নক্ষত্রের ঐ একটা নামই
আমার ভালো লাগে
সেও চেনেনা, শুধু বিশ্বাস করে ।

এই আমাদের প্রেম । সমস্ত কিছুকেই
নিজেদের ভালোলাগায় গ'ড়ে নেওয়া,
বুকের শূন্যতায় ভ'রে নেওয়া সমস্ত কিছুকেই
এমনকি অভিনয়কেও,
এমনকি নৈঃশব্দ্যকেও,
শূন্যতাকেও ।

একটা অচেনা ফুল তুলে নিয়ে সে বলে :
এটা যদি বকুল হ'ত ।
আমি বকুল চিনিনা
তবু বলি : তা কেন ?
ওটাতো বকুল, বকুলই ।
সেও চেনেনা, শুধু, বিশ্বাস করে ।

আমাদের কথা

আমরা আগে নির্বাচন করেছি কবি। কবিতা যিনি লেখেন তিনিই তো কবি। এই কবি মানুষটি—যিনি ব্যক্তিক আড়াল নিয়ে নানা বিরোধ ও বৈপরীত্য সত্ত্বেও দার্শনিক প্রত্যয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বাস্তবতা সচেতন এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে জীবনের সামগ্রিকতায় প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করে চলেছেন এমন কবিই আমাদের আগ্রহের কেন্দ্র। চল্লিশের দশকে আমাদের কবিরা রাজনৈতিক ইমানসিপেশনের কথা যদি বেশি বলে থাকেন, পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে তাঁরা হিউম্যান ইমানসিপেশনের কথা বলেছেন আরো বেশি। এই সময় থেকে তাঁদের কবিতার ধাত বদলেছে খাতও বদলেছে—লক্ষ্য বদলায়নি। কবিতায় মূর্ত বাস্তব যতটা বাঙালীর ততটাই ভারতীয় জনজীবনের। কারণ পুরাণ-লোকায়ত-প্রাকৃত-গাঁথা জাতির চেতনায় অবচেতনায় প্রবাহিত ঐতিহ্যই তো সদর্থক আধুনিকতার শিকড়। ষাটের দশকের গোড়া থেকে সংকট ঘনীভূত হচ্ছিল—আশির দশকে এসে ধাক্কা দিল টোট্যালিটারিয়ানিজমকে। সংকট চূড়া স্পর্শ করলো। উন্নত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকাকে স্বীকার করলেও অনুন্নত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে—তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ার আর টিমিসোয়ারার মতো ঘটনা ঘটলো। এক সময় যাঁরা নৌকো পুড়িয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন জীবনপ্রতিষ্ঠার অস্ত্র হাতে করে তাঁরা আজ স্বভাবতই এই সংকটে দীর্ণ। এই মুহূর্তে কবি বিষ্ণু দে-র কবিমনীষার অভাব বোধ হচ্ছে বেশি করে। আমাদের সৌভাগ্য কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও রাম বসু চিন্তায়, কবিতায় ও কাব্যনাট্যে এখনো অনলস। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, রাম বসু থেকে পরের প্রজন্মের কবিরা এবং আরো পরের প্রজন্মের কবিরা সকলেই আজ এই সংকটের শরীক।

১৯৬৬ থেকে এই কবিদের একেবারে শেষ কবিতাটি নিয়ে তিনটি সংকলনের পরিকল্পনা 'নির্বাচিত সাম্প্রতিক।' এই সংকলনে যেমন আমাদের কবিরা আছেন তেমনি সংখ্যায় বেশি না হলেও অন্য কবিরাও আছেন। আমাদের অনেক কবিকে স্থানাভাবে গ্রহণ করতে পারিনি। পরের সংকলন দুটিতে তাঁরাও আমাদের আগ্রহের কেন্দ্র হয়ে উঠবেন। কবি বিষ্ণু দে এবং রবীন সুর ও তরুণ সেন ছাড়া কোন প্রয়াত কবিকে 'নির্বাচিত সাম্প্রতিক-১' এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যাঁদের কবিতা সংকলনে ব্যবহার করেছি যদি কোন অপরাধ ঘটে থাকে তাঁদের সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। এবং পরবর্তী সংকলন দুটিতে প্রয়োজন বোধে তাঁদের আরো কয়েকটি করে কবিতা ব্যবহারের আগাম অনুমতি চেয়ে নিচ্ছি।

দীপেন রায়